পরশুরাম
গল্পসমগ্র

রাজশেখর বসু

যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত

সম্পাদনা : দীপংকর বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ শমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ অমিতাভ খান

© দীপংকর বসু

প্রথম সংস্করণ (তিন খণ্ডে) আশ্বিন ১৩৭৬ (১৯৬৯)
প্রথম অখণ্ড সংস্করণ
কার্তিক ১৩৯৯ নভেম্বর ১৯৯২
মূল্য ঃ ২০০ টাকা
এককালীন গ্রাহক মূল্য ঃ ১২৫ টাকা● দু' কিস্তিতে গ্রাহক মূল্য ঃ ১৫০ টাকা
বিমান ডাক খরচ সহ বিদেশের মূল্য
$ 16·00 £ 8·00

ISBN : 81-7157-044-5

মুদ্রাকর
প্রিন্ট-ও গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

পরশুরাম অংকিত চিত্র ৮
ভূমিকা/প্রমথনাথ বিশী ৯
বক্তব্য/দীপংকর বসু ৩৫
গড্ডালিকা ৩৭—১০০
রবীন্দ্রনাথের চিঠির পাণ্ডুলিপি ৩৮-৩৯
শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ৪১
চিকিৎসা-সঙ্কট ৫৭
মহাবিদ্যা ৬৯
লম্বকর্ণ ৭৭
ভুশণ্ডীর মাঠে ৯০

কজ্জলী ১০১—১৮৭

বিরিঞ্চিবাবা ১০৩
জাবালি ১২২
দক্ষিণ রায় ১৩৬
স্বয়ম্বরা ১৪৬
কচি-সংসদ ১৫৯
উলট-পুরাণ ১৭৭

হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প ১৮৯ - ২৭১

হনুমানের স্বপ্ন ১৯১
পুনর্মিলন ২০৩
উপেক্ষিত ২০৫
উপেক্ষিতা ২০৭
গরুবিদায় ২০৯
মহেশের মহাযাত্রা ২১৫
রাতারাতি ২২৬
প্রেমচক্র ২৪৩
দশকরণের বাণপ্রস্থ ২৫৬
তৃতীয়দ্যূতসভা ২৬২
আমের পরিণাম ২৭৩

গল্পকল্প ২৭৫—৩৩৫

গামানুষ জাতির কথা ২৭৭
অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা ২৮৫
রাজভোগ ২৯০
পরশ পাথর ২৯৪
রামরাজ্য ৩০১
শোনা কথা ৩০৮
তিন বিধাতা ৩১৪
ভীমগীতা ৩২২
সিদ্ধিনাথের প্রলাপ ৩২৬
চিরঞ্জীব ৩৩১

ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প ৩৩৭—৪২৯

ধুস্তুরী মায়া
(দুই বুড়োর রূপকথা) ৩৩৯
রামধনের বৈরাগ্য ৩৫১
ভরতের ঝুমঝুমি ৩৫৯
রেবতীর পতিলাভ ৩৬৬
লক্ষ্মীর বাহন ৩৭৩
অক্রূরসংবাদ ৩৮২
বদন চৌধুরীর শোকসভা ৩৯১
যদু ডাক্তারের পেশেন্ট ৩৯৫
রটন্তীকুমার ৪০৩
অগস্ত্যদ্বার ৪১২
ষষ্ঠীর কৃপা ৪১৯
গন্ধমাদন-বৈঠক ৪২৪

কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ৪৩১—৫০১

কৃষ্ণকলি ৪৩৩
জটাধর বকশী ৪৩৭
নিরামিষাশী বাঘ ৪৪২
বরনারীবরণ ৪৪৬
একগুঁয়ে বার্থা ৪৫৩
পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী ৪৫৯
নিকষিত হেম ৪৬৯
বালখিল্যগণের উৎপত্তি ৪৭৪
সরলাক্ষ হোম ৪৭৮
আতার পায়েস ৪৮৮
ভবতোষ ঠাকুর ৪৯৩
আনন্দ মিস্ত্রি ৫০২

নীল তারা ইত্যাদি গল্প ৫০৯—৫৯১

নীল তারা ৫১১
তিলোত্তমা ৫১৯
জটাধরের বিপদ ৫২৬
তিরি চৌধুরী ৫৩৩
শিবলাল ৫৪০
নীলকণ্ঠ ৫৪৫
জয়হরির জেব্রা ৫৫০
শিবামুখী চিমটে ৫৫৮
দ্বান্দ্বিক কবিতা ৫৬৫
ধনু মামার হাসি ৫৭২

চিত্রসূচী

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ৪১
রাম রাম বাবুসাহেব ৪৪
ঐসী গতি সন্‌সারমে ৪৮
আ—আ—আমি জানতে চাই ৫৩
কুছ্‌ভি নহি ৫৫
চিকিৎসা-সঙ্কট ৫৭
এখন জিভ টেনে নিতে পারেন ৫৯
হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ৬১
হয়, জানতি পার না ৬৩
হড্‌ডি পিল্‌পিলায় গয়া ৬৫
দি আইডিয়া ৬৭
বিপুলানন্দ ৬৮
মহাবিদ্যা ৬৯
লম্বকর্ণ ৭৭
'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা' ৮০
'হজৌর' ৮১
'ভুটে বললে—হালুম' ৮৫
'মরছি টাকার শোকে···' ৮৬
'লুচি ক-খানি খেতেই হবে' ৮৮
ভূশণ্ডীর মাঠে ৯০
লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল ৯২
গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া যায় ৯৩
খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল ৯৪
সড়াক্‌ করিয়া নামিয়া আসিল ৯৫
সব বন্ধকী তমসুক দাদা ৯৭
(শেষ) ৫৬ ৭৬ ৮৯ ১০০
বিরিঞ্চিবাবা ১০৩
তিনে-কত্তি তিন ১০৪
কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে ১০৮
'মাই ঘড্‌ ! ১১৬
'আঃ—ছাড়—ছাড়—লাগে' ১১৯
'যা' ১২১
জবালি ১২২
'রে রে রে রে' ১২৬
আবার নৃত্য শুরু করিলেন ১২৮
'রে নারকী যমরাজ' ১৩৪
'বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি' ১৩৫
দক্ষিণ রায় ১৩৬
চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল ১৪৫
স্বয়ম্বরা ১৪৬
দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছি ১৪৮
কিন্তু এমন সমনাসামনি ১৪৯
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ১৫৩
হাতাহাতি আরম্ভ হ'ল ১৫৫
ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক ১৫৬
নাচ শুরু করে দিল ১৫৮
কচি-সংসদ ১৫৯
আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি ১৬০
হোআট— হোআট - হোআট ১৬১
নকুড়-মামা ১৬২
পেলব রায় ১৬৪
এই কি কেষ্ট ? ১৬৮
সমগ্র কচি-সংসদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল ১
'এই বার দেখতো' ১৭৩
'বাবু বাগ গিয়া' ১৭৫
(শেষ) ১৭৬
উলট্‌-পুরাণ ১৭৭
(শেষ) ১৮৭
হনুমানের স্বপ্ন ১৯১
ওরে বানরাধম ১৯৪
হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই ২০১
জয় সীতারাম ২০২
পুনর্মিলন ২০৩
ছি ছি লজ্জায় মরি ! ২০৪
উপেক্ষিত ২০৫
শাহজাদী জবরউন্নিসা ২০৫
উপেক্ষিতা ২০৭
দেহলতা এলাইয়া দিল ২০৮
গুরুবিদায় ২০৯
নক্ষত্রবেগে সম্মুখে ছুটিল ২১২
কার সাধ্য রোধে তার গতি ২১৩
মহেশের মহাযাত্রা ২১৫
কি, কি ? এই যে আমি ২২৪
আছে, আছে সব আছে ২২৫
রাতারাতি ২২৬
এঁরা বাণী নিতে এসেছেন ২৩৪
হেলো বালীগঞ্জ থানা ২৪১
প্রেমচক্র ২৪৩
১—২৪৫ ২—২৪৬ ৩—২৪৭
৪—২৫০ ৫—২৫৩

পরশুরাম-অঙ্কিত (পেনসিলে)
(কার 'মুখ'-আনা নেই)

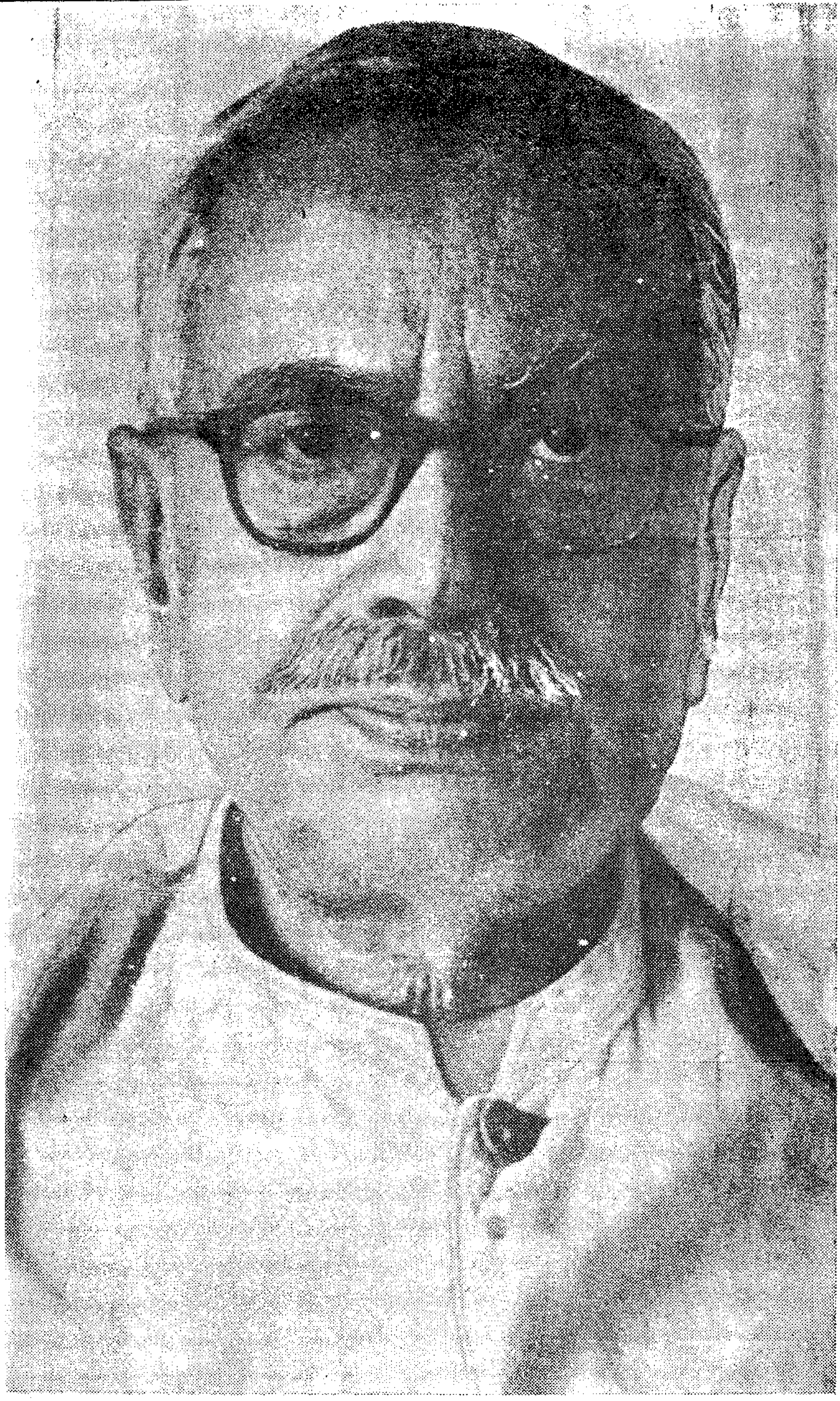

জন্ম : ১৬ মার্চ ১৮৮০

মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল ১৯৬০

লম্বকর্ণ

রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলেঘাটা-বেণ্ড প্রত্যহ বৈকালে খালের ধারে হাওয়া খাইতে যান। চল্লিশ পার হইয়া ইনি একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছেন; সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া এক্সারসাইজ করেন এবং ভাত ও লুচি বর্জন করিয়া দু-বেলা কচুরি খাইয়া থাকেন।

কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া বংশলোচনবাবু ক্লান্ত হইয়া খালের ধারে একটা ঢিপির উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—সাড়ে-ছটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। সিলোনে মনসুন পৌঁছিয়াছে। এখানেও যে-কোনও দিন হঠাৎ ঝড়-জল হওয়া বিচিত্র নয়। বংশলোচন উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতের বর্মাচুরুটে একবার জোরে টান দিলেন। এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি সুরে বলিতেছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!' ফিরিয়া দেখিলেন—একটি ছাগল।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লটপটে কানের উপর কচি পটলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনও অজাতশ্মশ্রু। বংশলোচন বলিলেন—'আরে এটা কোথা থেকে এল? কার পাঁঠা? কাকেও তো দেখছি না।'

ছাগল উত্তর দিল না। কাছে ঘেঁষিয়া লোলুপনেত্রে তাঁহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া বলিলেন—'যাঃ পালা, ভাগো হিঁয়াসে।' ছাগল পিছনের

দুপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সামনের দু-পা মুড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া রায়বাহাদুরকে ঢুঁ মারিল।

রায়বাহাদুর কৌতুক বোধ করিলেন। ফের ঠেলা দিলেন। ছাগল আবার খাড়া হইল এবং খপ করিয়া তাঁহার হাত হইতে চুরুটটি কাড়িয়া লইল। আহারান্তে বলিল—'অর্-র্-র্' অর্থাৎ আর আছে?

বংশলোচনের সিগার-কেসে আর একটিমাত্র চুরুট ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া দিলেন। ছাগলের মাথা-ঘোরা, গা-বমি বা অপর কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয় চুরুট নিঃশেষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'অর-র্-র্?' বংশলোচন বলিলেন —'আর নেই! তুই এইবার যা। আমিও উঠি।'

ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাশ করিতে লাগিল। বংশলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার-কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—'না বিশ্বাস হয়, এই দেখ্ বাপু।' ছাগল এক লম্ফে সিগার-কেস কাড়িয়া লইয়া চর্বণ আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'শ্শালা।'

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আর দেরি করা উচিত নয়। বংশলোচন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছাগল কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। বংশলোচন বিব্রত হইলেন। কার ছাগল কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না, নিকটে কোনও লোক নাই যে জিজ্ঞাসা করেন। ছাগলটাও নাছোড়বান্দা, তাড়াইলে যায় না। অগত্যা বাড়ি লইয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালই, নতুবা কাল সকালে যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

বাড়ি ফিরিবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ লইলেন, কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে আপাতত নিজেই উহাকে প্রতিপালন করিবেন।

হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল। তাঁহার যে এখন পত্নীর সঙ্গে কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তার পর দিন কতক অহিংস অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধি-স্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয়, বিশেষ উদ্‌বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু-জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার শখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।

চলিতে চলিতে রায়বাহাদুর পত্নীর সহিত কাল্পনিক বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একটা পাঁঠা পুষিবেন তাতে কার কি বলিবার আছে? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম,—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের নারভস্‌নেস? বংশলোচন বার বার মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা বসে তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর-বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমির—কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত

দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল। এই সূত্রে গতকল্য বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

বংশলোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত, অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি, কাল জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা—CAT। তার নীচে রচয়িত্রীর নাম—মানিনী দেবী। ইনিই গৃহকর্ত্রী। ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের তৈলচিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ তাহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই; কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওঁ-কার মাত্র। তা-ছাড়া কতকগুলি মেমের ছবি আছে, তাদের অঙ্গে সিল্কের ব্লাঙ্কশাড়ি এবং মাথায় কাল সুতার আলুলায়িত পরচুলা ময়দার কাই দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মুখের দুরন্ত মেম-মেম-ভাব ঢাকা পড়ে নাই, সেজন্য জোর করিয়া নাক বিঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরে দুটি দেওয়াল-আলমারিতে চীনেমাটির পুতুল এবং কাচের খেলনা ঠাসা। উপরের শুইবার ঘরের চারিটি আলমারি বোঝাই হইয়া যাহা বাড়তি হইয়াছে তাহাই নীচে স্থান পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার আসবাব, যথা—রাজা-রানীর ছবি, রায়-বাহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত ছোট-বড় সাহেবের ফোটোগ্রাফ, গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, অ্যালম্যানাক, ঘড়ি, রায়বাহাদুরের সনদ, কয়েকটি অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি আছে।

আজ যথাসময়ে আড্ডা বসিয়াছে। বংশলোচন এখনও বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিল ফরাশের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছেন। নগেন ও উদয় অতি কষ্টে ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে।

আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল—'যাই বল, বাঘের মাপ কখনই ল্যাজ-সুদ্ধ হ'তে পারে না। তা হ'লে মেয়েছেলেদের মাপও চুল-সুদ্ধ হবে না কেন? আমার বউ-এর বিনুনিটাই তো তিনফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আট ফুট লম্বা?'

নগেন বলিল—'দেখ্ উদো, তোর বউ-এর বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না। বাঘের কথা বলতে হয় বল্।'

চাটুজ্যে মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বলিলেন—'আঃ হা, তোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই?'

এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—'বাহবা, বেশ পাঁঠাটি তো। কত দিয়ে কিনলে হে?'

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন—'বেওয়ারিস মাল, বেশী দিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় ক'রে ফেল—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।'

চাটুজ্যে মশায় ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন—'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে!'

নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া বলিল—'উহুঁ, হাঁড়িকাবাব। একটু বেশী করে আদা-বাটা আর প্যাঁজ।

উদয় বলিল—'ওঃ, আমার বউ অ্যায়সা গুলিকাবাব করতে জানে!

নগেন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—'উদো, আবার?'

বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'তোমাদের কি জন্তু দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল কালিয়া আর কাবাব!'

ছাগলের সংবাদ শুনিয়া বংশলোচনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা টেঁপী এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ঘেণ্টু ছুটিয়া আসিল। ঘেণ্টু বলিল—'ও বাবা, আমি পাঁঠা খাব। পাঁঠার ম-ম-ম—'

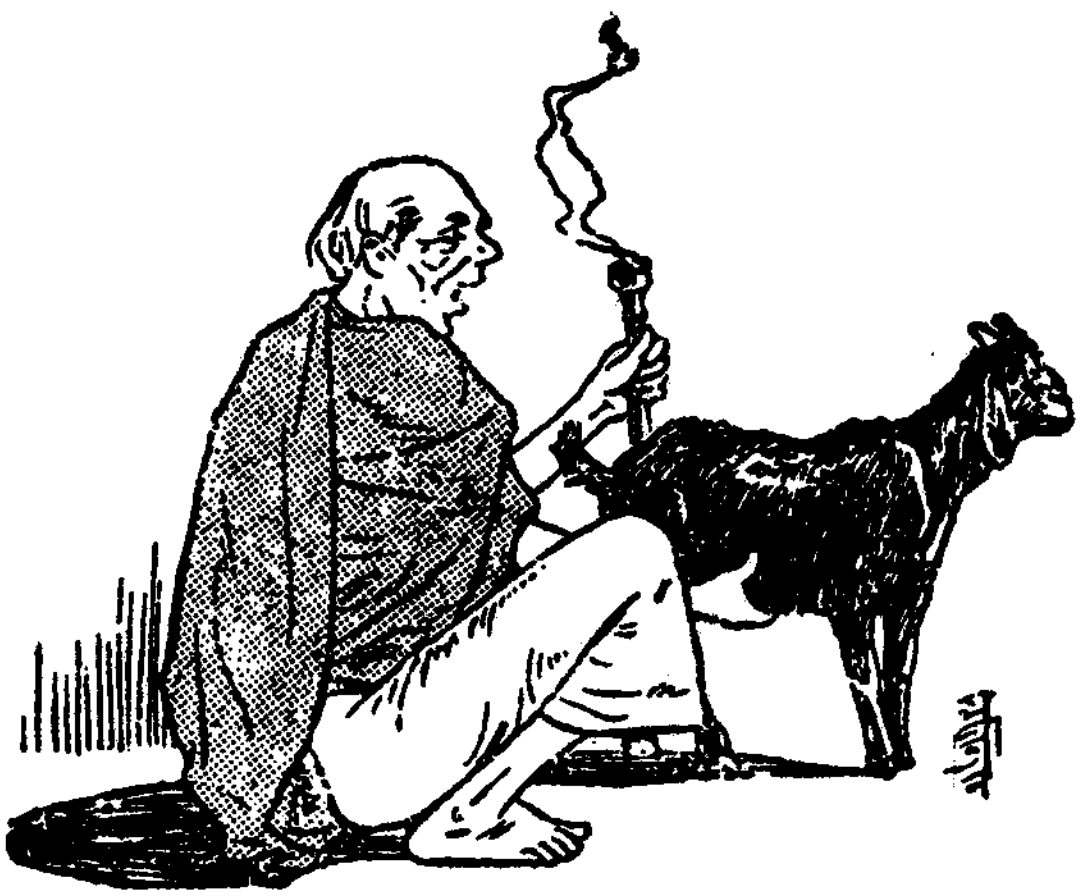

'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা'

বংশলোচন বলিলেন—'যা যাঃ, শুনে শুনে কেবল খাই খাই শিখছেন।'

ঘেণ্টু হাত-পা ছুড়িয়া বলিল—'হ্যাঁ আমি ম-ম-ম-মেটুলি খাব।'

টেঁপী বলিল—'বাবা, আমি পাঁঠাকে পুষবো, একটু লাল ফিতে দাও না।'

বংশলোচন। বেশ তো একটু খাওয়া-দাওয়া করুক, তার পর নিয়ে খেলা করিস এখন।

টেঁপী। পাঁঠার নাম কি বল না?

বিনোদ বলিলেন—'নামের ভাবনা কি। ভাসুরক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—'

চাটুজ্যে বলিলেন—'লম্বকর্ণই ভাল।'

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'টেঁপু, তোর মা এখন কি করছে রে?'

টেঁপী। এক্ষুনি তো কল-ঘরে গেছে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস? তা হ'লে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দি। দেখ্, ঝিকে বল, চট্ করে ঘোড়ার ভেজানো-ছোলা চাট্টি এনে এই বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ্, বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাস নি যেন।

উৎসাহের আতিশয্যে টেঁপী পিতার আদেশ ভুলিয়া গেল। ছাগলের গলায় লাল ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া বলিল—'ও মা, শীগ্‌গির এস, লম্বকর্ণ দেখবে এস।'

মানিনী মুখ মুছিতে মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—'আ মর ওটাকে কে আনলে? দূর দূর—ও ঝি, ও বাতাসী, শীগ্‌গির ছাগলটাকে বার করে দে, ঝাঁটা মার।'

টেঁপী বলিল—'বা রে, ওকে তো বাবা এনেছে, আমি পুষব।'

ঘেণ্টু বলিল—'ঘোড়া-ঘোড়া খেলব।'

মানিনী বলিলেন—'খেলা বার ক'রে দিচ্ছি। ভন্দর লোকে আবার ছাগল পোষে! বেরো বেরো—ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিং—'

'হজৌর' বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল! শীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো নাম—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।

'হজৌর

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া দরোয়ানকে বলিলেন—'ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এক্ষুনি ছিল্টি নোংরা করেগা।'

চুকন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা।'

বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন—'দেখো চুকন্দর সিং, এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।'

চুকন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা।'

মানিনী স্বামীর প্রতি একটি অগ্নিময় নয়নবান হানিয়া বলিলেন—'হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল—গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।' হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়।

বংশলোচন বলিলেন—'টেঁপু, ঝিকে ব'লে দে, বৈঠকখানা-ঘরে আমার শোবার বিছানা ক'রে দেবে। আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ্ ঠাকুরকে বল আমি মাংস খাব না। শুধু খানকতক কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।'

পুরাকালে বড়লোকদের বাড়িতে একটি করিয়া গোসাঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্যপুত্রদের জন্য সে-রকম কোনও পাকা বন্দোবস্ত ছিল না অগত্যা তাঁহারা এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা-ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাঁর ঘুম হয় না, এজন্য ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং এক-খানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়ের সম্বল, পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন—তিনি কী এমন অন্যায় কাজ করিয়াছেন যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন? বাপের বাড়ি যাবেন —ইস্, ভারী তেজ! তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। গৃহিণী শখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন তা তো বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই তো সেদিন পনরটা জলচৌকি তেইশটা বঁটি এবং আড়াই শ টাকার খাগড়াই বাসনা কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা? হুঃ, যতো সব—। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর সুইচ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুইটা বর্মা চুরুট খাইয়া তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি একটা আন্দাজ জোরে হাওয়া উঠিল। ঠাণ্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠকখানা-ঘর হইতে মিটমিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তাহার বন্ধনরজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাশের এক কোণে একগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুখাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।

বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন—সন্ধিস্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁহার একটা নরম গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব হইল। নিদ্রাবিজড়িত স্বরে বলিলেন—'কখন এলে?' উত্তর পাইলেন—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।'

হুলস্থুল কাণ্ড। চোর—চোর—বাঘ হ্যায়—এই চুকন্দর সিং—জল্‌দি আও—নগেন—উদো-শীগ্‌গির আয়—মেরে ফেললে—

চুকন্দর তার মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাতা টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ দু-এক ঘা মার খাইয়া ব্যা ব্যা করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন বাঘ বরঞ্চ ছিল ভাল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েছে।

ভোরবেলা বংশলোচন চুকন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন—কোনও ভালো আদমী ছাগল পুষিতে রাজী আছে কি না। যে-সে লোককে তিনি ছাগল দিবেন না। এমন লোক চাই যে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেচিবে না, মাংসের লোভে মারিবে না।

আটটা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্বাটীর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, নাপিত কামাইয়া দিতেছে। বিনোদবাবু ও নগেন অমৃতবাজারে ড্যালহাউসি ভার্সস মোহনবাগান পড়িতেছেন। উদয় ল্যাংড়া আমের দর করিতেছে। এমন সময় চুকন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—'লাটুবাবু আয়ে হেঁ।'

তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার—ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্বতাকার ঝুঁটি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গায়ে আগুল্‌ফ-লম্বিত পাতলা পঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।

বংশলোচন বলিলেন—'আপনাদের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

লাটুবাবু বলিলেন—'আমরা বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড। ব্যাণ্ড-মাস্টার লটবর লন্দী—আমীন। লোকে লাটুবাবু ব'লে ডাকে। শুনলুম আপনি একটি পাঁঠা বিলিয়ে দেবেন, তাই সঠিক খবর নিতে এসেছি।'

বিনোদ বলিলেন—'আপনারা বুঝি কানেস্তারা বাজান?'

লাটু। কানেস্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কলসার্ট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্ল্যারিয়নেট এই লরহরি লাগ ফুলোট—এই লবকুমার লন্দন ব্যায়লা। তা ছাড়া কর্নেট, পিকলু, ট্রামোনিয়া, ঢোল, কত্তাল সব নিয়ে উলিশজন আছি। বর্মা অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট-সাহেবের সেদিন বে হ'ল, ফিষ্টি দিলে, আমরা বাজালুম, সাহেব খুশী হয়ে টাইটিল দিলে—কেরাসিন ব্যাণ্ড।

বংশলোচন। দেখুন আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—

লাটু। আমরা হলুম উলিশটি প্রাণী, একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি?

নরহরি। লস্যি, লস্যি।

বংশলোচন। আমি এই শর্তে দিতে পারি যে ছাগলটিকে আপনি যত্ন ক'রে মানুষ করবেন, বেচতে পাবেন না, মারতে পারবেন না।

লাটু। এ যে আপনি লতুন কথা বলছেন মশায়। ভদ্দর লোকে কখনও ছাগল পোষে?

নরহরি। পাঁঠী লয় যে দুধ দেবে।

নবীন। পাখি লয় যে পড়বে।

নবকুমার। ভেড়া লয় যে কম্বল হবে।

বংশলোচন। সে যাই হোক। বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই। নেবেন কি না বলুন।

লাটুবাবু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বললেন—'লিয়ে লাও হে লাটুবাবু লিয়ে লাও। ভদ্দর নোক বলছেন অত ক'রে।'

বংশলোচন। কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।

লাটু। সে আপনি ভাববেন না। লাটু লন্দীর কথার লড়চড় লেই।

লম্বকর্ণকে লইয়া বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড চলিয়া গেল। বংশলোচন বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—'ব্যাটাদের দিয়ে ভরসা হচ্ছে না!' বিনোদ আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'ভেবো না হে, তোমার পাঁঠা গন্ধর্বলোকে বাস করবে। ফাঁকে পড়লুম আমরা।'

সন্ধ্যার আড্ডা বসিয়াছে। আজও বাঘের গল্প চলিতেছে। চাটুজ্যে মহাশয় বলিতেছেন—'সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব'লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই। ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলা হ'তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেছ—আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকেই জানা আছে। আমাদের রায়বাহাদুর ছাগলটা বিদেয় ক'রে খুব ভাল কাজ করেছেন। কেটে খেয়ে ফেলতেন তো কথাই ছিল না, কিন্তু বাড়িতে রেখে বাড়তে দেওয়া—উঁহু।'

বংশলোচন একখানি নূতন গীতা লইয়া নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন—নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অর্থাৎ কিনা, আত্মা একবার হইয়া আর যে হইবে না তা নয়। অজো নিত্যঃ—অজো কিনা ছাগলং। ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে, তখন আজ সন্ধিস্থাপনা হইলেও হইতে পারে।

বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন—'হে কৌন্তেয়, তুমি শ্রীভগবানকে একটু থামিয়ে রেখে একবার চাটুজ্যে মশায়ের কথাটা শোন। মনে বল পাবে।

উদয় বলিল—'আমি সেবার যখন সিমলেয় যাই—'

নগেন। মিছে কথা বলিস নি উদো। তোর দৌড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অব্‌ধি।

উদয়। বাঃ আমার দাদাশ্বশুর যে সিমলেয় থাকতেন। বউ তো সেইখানেই বড় হয়। তাইতো রং অত—

নগেন। খবরদার উদো।

চাটুজ্যে। যা বলছিলুম শোন। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হ'ল ইয়া লাশ, ইয়া সিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ—লুচি, পাঁঠার কালিয়া, এইসব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম—দেখছ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসী হ'লে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বচ্ছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খসে গেছে, মুখ একেবারে হাঁড়ি; বর্ণ হয়েছে যেন কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায়—আঁজি-আঁজি ডোরা-ডোরা। ডাকা হ'ল—ভুটে, ভুটে! ভুটে বললে—হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক'রে ফিরে এল।

'লাটুবাবু আয়ে হেঁ।'

সপারিষদ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণও সঙ্গে আছে। বিনোদ বলিলেন—'কি ব্যাণ্ড মাস্টার, আবার কি মনে করে?'

লাটুবাবুর আর সে লাবণ্য নাই। চুল উশ্‌ক খুশ্‌ক, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজলনয়নে হাঁউমাউ করিয়া বলিলেন—'সর্বনাশ হয়েছে মশায়, ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হোঃ হোঃ হোঃ।'

নরহরি বলিলেন—আঃ কি কর লাটুবাবু একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েছেন তখন একটা বিহিত করবেনই।'

বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন—'কি হয়েছে—ব্যাপার কি?'

লাটু। মশাই, ওঁই পাঁঠাটা—

চাটুজ্যে বলিলেন—'হুঁ, বলেছিলুম কি না?'

লাটু। ঢোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে, হারমোনিয়ার চাবি সমস্ত চিবিয়েছে। আর—আর—আমার পাঞ্জাবির পকেট কেটে লব্বই টাকার লোট—ও হো হো!

'ভুটে বললে—হালুম'

নরহরি। গিলে ফেলেছে। পাঁঠা নয় হুজুর, সাক্ষাৎ শয়তান। সর্বস্ব গেছে, লাটুর প্রাণটি কেবল আপনার ভরসায় এখনও ধুক-পুক করছে।

বংশলোচন। ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি।

নরহরি। দোহাই হুজুর, লাটুর দশাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন—বেচারা মারা যায়।

বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন—'একটা জোলাপ দিলে হয় না?'

লাটুবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—'মশায়, এই কি আপনার বিবেচনা হ'ল? মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?'

বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন, ছাগলটাকে দিতে বলছি।

নরহরি। হায় হায়, হুজুর এখনও ছাগল চিনলেন না! কোন্ কালে হজম ক'রে ফেলেছে। লোট তো লোট—ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, মায় ইস্টিলের কত্তাল।

বিনোদ। লাটুবাবুর মাথাটি কেবল আস্ত রেখেছে।

বংশলোচন বলিলেন—'যা হবার তা তো হয়েছে। এখন বিনোদ, তুমি একটা খেসারত ঠিক করে দাও। বেচারার লোকসান যাতে না হয়, আমার ওপর বেশী জুলুমও না হয়। ছাগলটা বাড়িতেই থাকুক, কাল যা হয় করা যাবে।'

মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?'

অনেক দরদস্তুরের পর একশ টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশী কষাকষি করিতে দিলেন না। লাটুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেঁপী ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন,—'ও টেঁপুরানী শীগগির গিয়ে তোমার মাকে বলো কাল আমরা এখানে খাব—লুচি, পোলাও, মাংস—'

টেঁপী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ। বল কি! হ্যাঁ হে বংশু, প্রেমটা এক পাঁঠা থেকে বিশ্ব পাঁঠায় পৌঁছেছে না কি? আচ্ছা তুমি না খাও আমরা আছি। যাও তো টেঁপু, মাকে বল সব যোগাড় করতে।

টে'পী। সে এখন হচ্ছে না। মা-বাবার ঝগড়া চলছে, কথাটি নেই।

বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন— 'হ্যাঁ হ্যাঁ—কথাটি নেই—তুই সব জানিস। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েছিস।'

টে'পী। বা-রে, আমি বুঝি টের পাই না? তবে কেন মা খালি-খালি আমাকে বলে—টে'পী, পাখাটা মেরামত করতে হবে—টে'পী, এ-মাসে আরও দু-শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন?

বংশলোচন। থাম্ থাম্ বকিস নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েছে বল?

বংশলোচন। আরে এতদিন তো সব মিটে যেত, ওই ছাগলটাই মুশকিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ। তোমারই বা অত মায়া কেন? খেতে না পার বিদেয় করে দাও। জলে বাস কর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ ক'রো না।

বংশলোচন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'দেখি কাল যা হয় করা যাবে।'

এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহশয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুবিধা পায় নাই।

পরদিন বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আছে। ঝি-চাকর অন্দরে কাজকর্মে ব্যস্ত। চুকন্দর সিং তার ঘরে বসিয়া আটা সানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে বাঁধা আছে এবং দড়ির সীমার মধ্যে যথাসম্ভব লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগল-লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন।

পাছে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলিপি কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খাল-ধারে পৌঁছিলেন।

আজ তিনি স্বহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জন দিবেন, যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিবেন—যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলিপির ঠোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন—

এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।

লেখার পর কাগজ ভাঁজ করিয়া ছোট টিনের কৌটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তার পর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত।

দূরে আসিয়াও বংশলোচন বার বার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছে। যদি তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এখনি পশ্চাদ্ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন।

আর পারা যায় না, হাঁফ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুলগাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা যায় না। এইবার তাহার মুক্তি—আর কিছুদিন দেরি করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। এই হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন। গৃহিণী তাহার উপর মর্মান্তিক রুষ্ট, আত্মীয়স্বজন তাহাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—তিনি একা কাঁহাতক সামলাইবেন? হায় রে সত্যযুগ, যখন শিবি

রাজা শরণাগত কপোতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন—মহিষীর ক্রোধ, সভাসদ্‌বর্গের বেয়াদবি, কিছুই তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই।

দ্রুম্‌ দুদ্দুড় দুড়ু দড়ড়ড় ড়! আকাশে কে ঢেঁটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসা-রঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পলাইতেছে। সমস্ত চুপ—গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ভ হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে হাঁটার ফলে তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ—কড় কড় কড়াৎ—ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশানকোন হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে যা-কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ওই এল, ওই এল! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা-লম্বা তালগাছগুলো প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া

'লুচি ক-খানি খেতেই হবে'

আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইঢিবি - এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।

মান-ইজ্জত কাপড়-চোপড় সবই গিয়াছে, এখন প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হা রে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে—

বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগনী আলো খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশ কোটি ভোল্ট ইলেকট্রিসিটি অদূরবর্তী একটা নারিকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকট নাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

রাশি রাশি সরিষার ফুল। জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই, আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু এখনো সোঁ সোঁ করিয়া হাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া মেঘের পর্দা ঠেলিয়া দেবতারা দু-চারটা মিটমিটে তারার লণ্ঠন লইয়া নীচের অবস্থা তদারক করিতেছেন।

বংশলোচন কর্দম-শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কে? রায়-বাহাদুর। কোথায়? খালের নিকট। ও কিসের শব্দ? সোনা-ব্যাং। তাঁর নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। ছাগলটা?

মানুষের স্বর কানে আসিতেছে। কে তাঁকে ডাকিতেছে? 'মামা—জামাইবাবু—বংশু আছ?—হজোর—'

অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। জনকতক লোক লণ্ঠন লইয়া ইতস্তত ঘুরিতেছে এবং তাঁহাকে ডাকিতেছে। একটি পরিচিত নারীকণ্ঠে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।

রায়বাহাদুর চাঙ্গা হইয়া বলিলেন—'এই যে আমি এখানে আছি—ভয় নেই—'

মানিনী বলিলেন—'আজ আর দোতলায় উঠে কাজ নেই। ও ঝি, এই বৈঠকখানা ঘরেই খড় ক'রে বিছানা ক'রে দে তো। আর দেখ, আমার বালিশটাও দিয়ে যা। আঃ, চাটুজ্যে মিনসে নড়ে না, ও কি—সে হবে না—এই গরম লুচি ক-খানি খেতেই হবে, মাথা খাও। তোমার সেই বোতলটায় কি আছে—তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব নাকি?'

'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—'

বংশলোচন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'আ্যাঁ, ওটা আবার এসেছে? নিয়ে আয় তো লাঠিটা—'

মানিনী বলিলেন,—'আহা কর কি, মেরো না। ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ, হরি মধুসূদন!'

লম্বকর্ণ বাড়িতেই রহিয়া গেল, এবং দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার আধ হাত দাড়ি গজাইল। রায়বাহাদুর আর বড়-একটা খোঁজ খবর করেন না. তিনি এখন ইলেকশন লইয়া ব্যস্ত। মানিনী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য সাবান ও ফিনাইল ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রূপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়. নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে—ব-ব-ব—অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও. আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না।

ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৩১
(১৯২৪)

শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটি গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ি, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েক ঘর প্রজা—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাহা সম্পত্তি এবং যজমান-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না। তাহার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, আঁটো-সাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তাহার যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু শিবু সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। পাঁচমিনিট বকাবকির পরেই শিবুর দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবুরই পরাজয় ঘটিত। স্ত্রীকে বশে রাখিতে না পারায় পাড়ার লোকে শিবুকে কাপুরুষ, ভেড়ো, মেনী-মুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনিল তাহার স্বামীর চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। সেদিনকার

বচসা চরমে পৌঁছিল—নৃত্যকালীর ঝাঁটা শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে ক্ষোভে কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কোনও গতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছ-টার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

শেয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া শিবু নানা উপাচারে পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—'হে মা কালী, মাগীকে ওলাউঠোয় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্যি দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা ক'রে দাও মা, যাতে আবার নতুন ক'রে সংসার পাততে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হ'ল না, সেটাও তো দেখতে হবে। দোহাই মা!'

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙা তেলেভাজা খাবার, আধ সের দই এবং আধ সের অমৃতি খাইল। তার পর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, জাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বীডন স্ট্রীটের হোটেল-ডি-অর্থোডক্সে এক প্লেট কারি, দু প্লেট রোস্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল জলযোগ করিল। তার পর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটি ফিরিয়া গেল।

মা-কালী কিন্তু উলটা বুঝিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়াই শিবুর ভেদবমি আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটির আড়পাড় কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তরমুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরও দু-তিন ক্রোশ দূরে ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য। এককালে এখানে ইটখোলা ছিল সেজন্য সমতল নয়, কোথাও গর্ত, কোথাও মাটির ঢিপি। মাঝে মাঝে আসশ্যাওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।

যাঁহারা স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই।—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁহারা মরিলে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিংরুমে জমায়েত হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা পাসে ওয়েটিংরুম ছাড়িতে পারে না। যাঁহারা seance দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কি-রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল, দয়া হৃষীকেশ, নির্বাণ, মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্র-তত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যক-মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেহ-বা দশ-বিশ বৎসর পরে, কেহ-বা দু-তিন শতাব্দী পরে।

ভূতদের মাঝে-মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফুর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্মশরীর বেশ হালকা ঝরঝরে হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সুবিধা আছে। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতিনাথ বা রথের উপর বামনদর্শন ঘটে, কিংবা যাঁহারা স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষীকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মুক্তি।

দু-তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ হউক, নৃত্যের একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হ'ক, না-হয় পেনেটিতেই আস্তা গাড়ি। তার পর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দ

লক্ষ্য জিব. কাটিয়াছিল

ঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুবরে পোকা ভর্‌র্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে একজোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদ্‌গদ স্বরে মাঝে-মাঝে ক-অ-অ করিতেছে। একটা কট্‌কটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া টিটকারি দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিপোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সংগত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রিরিরিরি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁখাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক ধড়াক

গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া যায়

করিতে লাগিল। মনে পড়িল—ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলি-বিলের ধারে শ্যাওড়া-গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু তোব-ড়াইয়াছে এবং সামনের দুটো দাঁত নাই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

একটি শাঁকচুন্নী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছিল। সে একটা গামছা পরিয়া আর

একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তাহার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফ্যাঁচ করিয়া ওঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রং! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।

খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা রা রা রা রা রা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্‌লুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—'তালগাছে কে রে?'

সড়াক্ করিয়া নামিয়া আসিল

উত্তর আসিল—'কারিয়া পিরেত বা।'
শিবু। কেলে ভূত? নেমে এস বাবা।
মাথায় পাগড়ি, কাল লিকলিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা সড়াক করিয়া

তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—'গোড় লাগি ধরমদেওজী।'

শিবু। জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

কারিয়া পিরেত। ছিলম বা?

শিবু। তামাকই নেই তা ছিলিম। যোগাড় কর্ না।

প্রেত ঊর্ধ্বে উঠিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে বৈদ্যবাটির বাজার হইতে তামাক টিকা কলিকা আনিয়া আগ শুলগাইয়া শিবুর হাতে দিল। শিবু একটা কচুর ডাঁটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—'তার পর, এলি কবে? তোর হাল চাল সব বল্।'

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম এই।—

তাহার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তাহার জরু গরু জমি জেরাত সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, বনিবনাও কখনও হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয়, এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে যে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরি করিয়া অবশেষে চাঁপদানির মিলে কুলীর কাজে ভর্তি হয় এবং কয়েক বৎসর মধ্যে সর্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্বে একটি লোহার কড়ি হাফিজ অর্থাৎ কাঁপকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তার পর একমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মত আওয়াজ আসিল—'ভায়া, কলকেটায় কিছু আছে না কি?'

বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুণ্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হয়ে আগলাচ্ছি। বেশী কিছু নয়—দু-পাঁচশো। সব বন্ধকী তমসুক দাদা—ইণ্টাম্বর কাগজে লেখা—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না। খবরদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে, থুঃ থুঃ!

শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—'যক্ষ মহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—'

যক্ষ। ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে। ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জানলে কিসে হ্যা?

শিবু। আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েছে?

যক্ষ। আমার আগমন? হ্যা, হ্যা! আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তাও দেখলুম। আরে তুমি তো সেদিন এলে, কার্টাপ পড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেছি আমি। তোমার গানের শখ আছে

সব বন্ধকী তমসুক দাদা

দেখেছি—বেশ বেশ। কালোয়াতি শিখতে যদি চাও তো আমার শাগরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু। মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

যক্ষ। বিলক্ষণ। আমার নাম ৺নদেরচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি, ইলাকা রিশড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বর। জর্জটি সাহেবের নাম শুনেছ? হুগলির কালেক্টর—ভারি ভালবাসত আমাকে। মুলুকের শাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকের দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু। মশায়ের পরিবারাদি কি?

যক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা! ঘরসংসার মন্দ তো ছিল, কিন্তু গিন্নীটি ছিলেন খাণ্ডার। বলব কি মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক—কোম্পানির ফৌজদারী নিজামত আদালত যার মুঠোর মধ্যে—আমারই পিঠে দিলেন। এক ঘা চেলা-কাঠ কশিয়ে! তার পরেই পালাল বাপের বাড়ি। তিন-শ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা? গুরু আছেন, ধর্ম আছেন। সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফৌত হ'ল। সংসারধর্মে আর মন বসল না। জর্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনশন নিয়ে এক শখের যাত্রা খুললুম। তার পর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েছি। ছেলেপুলে হয় নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন্ আবাগের-বেটা-ভূত মানুষ হয়ে আমার

ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিস হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগলাই, গঙ্গার হাওয়া খাই আর বব-বম্ করি। থাক, আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।'

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, কারিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—'সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি। পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে ফল নেই, এখন একটু গাওনা-বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই—তেমন জুত হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহুঁ—ঢনঢন করছে। বাবা ছাতুখোর, একটু এঁটেল-মাটি চটকে এই মধ্যিখানে থাবড়ে দে তো। ঠিক হয়েছে। চৌতাল বোঝ? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল শোন—

ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তা কে।
ধরে তাড়া ক'রে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধ'রে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে।
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্টে পাল্টে ফ্যালে
গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;
ধাক্কা ধুক্কি দিতে ছুটি ধনী করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—
'ধা'-এর উপর সম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা।

এই 'ধা' ফসকালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আসছে। খোট্টাভুত, আর এক ছিলিম সাজ বেটা।'

উদ্‌যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। অনেক কাকুতি-মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সে এখনও কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক পদ্ধতিতে শিবুর বিবাহ। সূর্যাস্ত হইবামাত্র শিবু সর্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আটা দিয়া পইতা মাজিল, ফণি-মনসার বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বনজঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একরাশ ঘেঁটুফুল, বঁইচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তারপর সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐকতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরী বামনীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদ্‌যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—'এইবার ঘোমটাটা খুলতে হচ্ছে।'

ডাকিনী ঘোমটাটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—'অ্যাঁ! তুমি নেত্য '

নৃত্যকালী বলিল—'হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিলে ম'রে আমায় কবল থেকে বাঁচবে! পেত্নী শাঁকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?'

শিবু। এলে কি ক'রে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী। ওলাউঠো শত্তুরের হ'ক। কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?

শিবু। তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্ছে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। ধাতটাও একটু নরম হয়েছে নাকি?

শুভকর্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলযোগ? যেন একপাল শকুনি-গৃধিনী

ঝুটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উল্‌কার মত ছুটিয়া আসিয়া পেত্নী ও শাঁকচুন্নী উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিল (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামত বসাইয়া লইবেন)।

পেত্নী। আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা?

শাঁকচুন্নী। আ মর বুড়ী, ও যে তোর নাতির বয়সী।

পেত্নী। আহা, কি আমার কনে বউ গা!

শাঁকচুন্নী। দূর মেছোপেত্নী, আমি যে ওর দু-জন্ম আগেকার বউ।

পেত্নী। দূর গোবরচুন্নী, আমি যে ওর তিন জন্ম আগেকার বউ।

শাঁকচুন্নী। মর চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনি মাগী মিন্‌সেকে নিয়ে উধাও হ'ক।

তখন পেত্নী বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—'আগে তোর ঘাড় মটকাব তার পর ডাইনি বেটীকে খাব।'

কামড়াকামড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরও দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পইতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনী, শুনছ কিবা আনমনে,
ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশি ডাকছে তোমায় বাঁশবনে।
ওটা যে খ্যাঁকশেয়ালী, দিও না কুলে কালী।
রাত-বিরেতে শ্যালকুকুরের ছুঁচোপ্যাঁচার ডাক শুনে।

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—'ভায়া, এখানে হচ্ছে কি? এত গোল কিসের?'

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—'এ বরম পিচাস, আরে দরবাজা তো খোল।'

শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবন্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও ভাঙ্গিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটনমন্ত্র পড়িল—

মারে জ্‌ জুয়ান—হে'ইয়া
আউর ভি ধোড়া—হে'ইয়া
পর্বত তোড়ি—হে'ইয়া
চলে ইঞ্জন—হে'ইয়া
ফটে বয়লট—হে'ইয়া
খবরদার—হা-ফিজ।

মড় মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—'একি, গিন্নী! এখানে? বেহ্মদত্যি-টার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েছ?' ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—'আরে মুংরী, তোহর শরম নহি বা?'

* * *

তার পর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী—এই ডবল গ্রাহস্পর্শযোগে ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পুক, পিক্সি, নোম, গব্‌লিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ্ প্রভৃতি লম্বা-দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপা-দাপি আরম্ভ করিল। চিং চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডী আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্যসমস্যার সমাধান করিবে? আমার কম্ম নয়। ভূতজাতি অতি নাছোড়বান্দা, ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব—এসব তাহারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনও রকম নীতি-বিগর্হিত বিদ্‌কুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩০ (১৯২৩)

আলিপুরের সংবাদ—সাগর আইলাণ্ডে বায়ুমণ্ডলে যে গর্ত হইয়াছিল সেটা সম্প্রতি পাকারকম ভরাট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর বৃষ্টি হইবে না। চৌরঙ্গিতে তিনটা সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। ঘোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ-কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষরাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকায় এক গণ্ডা রোগা-রোগা ফুলকপির বাচ্ছা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ-ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগ্‌বিজয়ে যাইতেন।

আদালত বন্ধ, আমার গৃহ মক্কেলহীন। সার্কুলার রোডে ধাপা-মেলের বাঁশি পোঁ করিয়া বাজিল—চমকিত হইয়া দেখিলাম বড় ছেলেটা জিওমেট্রি ত্যাগ করিয়া রেলের টাইম-টেবুল অধ্যয়ন করিতেছে। ছোট ছেলেটার ঘাড়ে এঞ্জিনের ভূত চাপিয়াছে, সে ক্রমাগত দু-হাতের কনুই ঘুরাইয়া ছুঁচার মতন মুখ করিয়া বলিতেছে—ঝুক ঝুক ঝুক ঝুক। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এবার কোথা যাওয়া যায়? দু-একজন মহাপ্রাণ বন্ধু বলিলেন—পূজার ছুটিতে দেশে যাও, পল্লীসংস্কার কর। কিন্তু অতীব লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বহু বহু সৎকার্যের ন্যায় এটিও আমার দ্বারা হইবার নয়। জানামি ধর্মং—অন্ততঃ মোটামুটি জানি, কিন্তু ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। ভ্রমণের নেশা আমার মাথা খাইয়াছে।

পদব্রজ, গোযান, মোটর, নৌকা, জাহাজ—এসব মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার জন্য মন্দ নয়। কিন্তু যানের রাজা রেলগাড়ি, রেলগাড়ির রাজা ই. আই. আর। বন্ধু বলেন—ইংরেজের জিনিসে তোমার অত উৎসাহ ভাল দেখায় না। আচ্ছা, রেল না-হয় ইংরেজ করিয়াছে কিন্তু খরচটা কে যোগাইতেছে? আজ না-হয় আমরা ইংরেজকে সহিংস বাহবা দিতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন সেও আমাদের কীর্তি অবাক্ হইয়া দেখিত। আবার পাশা উল্টাইবে, দু-শ বৎসর সবুর কর। তখন তারায় তারায় মেল চালাইব, ইংরেজ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিবে, সঙ্গে লইব না,—পয়সা দিলেও না।

বাংলার নদ-নদী, ঝোপ-ঝাড়, পল্লীকুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানাপুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলের গন্ধ—এসব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়,

নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম, পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম, পুরী-কচৌড়ি, রোটি-কাবাব, dinner sir at Shikohabad ? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু-পাশে আখের খেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান অরণ্যানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তার পর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী —তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জিরডাণ্ডার ঝঞ্চনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিতপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত্!

এই পাশবিক পরিকল্পনা—এই অহেতুকী রেলওয়েপ্রীতি—ইহার পশ্চাতে মনস্তত্ত্বের কোন্ দুষ্ট সর্প লুক্কায়িত আছে? গিরীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম—ডালহাউসি যাইব, আমার এক পঞ্জাবী বন্ধুর নিমন্ত্রণে। একাই যাইব, গৃহিণীকে একটা মোটা রকম ঘুষ এবং অজস্র থিয়েটার দেখার অনুমতি দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিব। কিন্তু man proposes woman disposes।

আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি—

আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি, হঠাৎ বিদ্যুল্লতার মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন—'হোআট-হোআট-হোআট?'

এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। গৃহিণীর ইংরেজী বিদ্যা ফার্স্ট বুক পর্যন্ত। কিন্তু তিনি আমার ফাজিল শ্যালকবৃন্দের কল্যাণে গুটিকতক মুখরোচক ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই সেগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম—'এই মনে করছি ছুটির ক-দিন একটু পাহাড়ে কাটিয়ে আসি, শরীরটা একটু ইয়ে কিনা।'

গৃহিণী বলিলেন—'হোআট ইয়ে? হুঁ, একাই যাবার মতলব দেখছি—আমি বুঝি একটা মস্ত ভারী বোঝা হয়ে পড়েছি? পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা হবে নাকি?'

সভয়ে দেখিলাম শ্রীমুখ ধূমায়মান, বুঝিলাম পর্বতো বহ্নিমান্। ধাঁ করিয়া মতলব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিলাম—'রাম বল, একা কখনও তপস্যা হয়? আমি হব না হব না হব না তাপস যদি না মিলে তপস্বিনী।'

মন্ত্রবলে স্মোক নুইসান্স কাটিয়া গেল, গৃহিণী সহাস্যে বলিলেন—'হোআট পাহাড়?'

'হোআট—হোআট—হোআট'

আমি। ডালহাউসি। অনেক দূর।

গৃহিণী। হ্যাং ডালহাউসি। দার্জিলিং চল। আমার ত্রিশ ছড়া পাথরের মালা না কিনলেই নয়, আর চার ডজন ঝাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার শুঁয়ো-পোকা কেনা হ'ল—সেই যে বোআ না কি বলে—আর হীরে-বসানো চরকা-ব্রোচ—তা তো এ পর্যন্ত পরতেই পেলুম না। তোমার সেই ডালকুত্তো পাহাড়ে সেসব দেখবে কে? দার্জিলিং-এ বরঞ্চ কত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে। টুনি-দিদি, তার ননদ, এরা সব সেখানে আছে। সরোজিনীরা, সুকু-মাসী, এরাও গেছে। মংকি মিত্তিরের বউ তার তেরোটা এঁড়িগেঁড়ি ছানাপোনা নিয়ে গেছে।

যুক্তি অকাট্য, সুতরাং দার্জিলিং যাওয়াই স্থির হইল।

দার্জিলিং-এ গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক্ আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্‌টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি।...জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম —অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভাল লাগে না...এমন সময় অনতিদূরে—

নকুড়-মামা

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত আশ্চর্য রকম মিল আছে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট অন্যপ্রকার,—বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখা হইল ডুমুরাওনের মোক্তার নকুড় চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি সম্পর্কনির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী ম্যামা।

নকুড়-মামা পথের পার্শ্বস্থিত খাদের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ওভারকোট, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিরক্তি। আমাকে দেখিয়া কহিলেন—'ব্রজেন নাকি?'

বলিলাম—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর, আপনি হঠাৎ দার্জিলিং-এ? বাড়ির সব ভাল তো? কেষ্টার খবর কি—বেনারসেই আছে নাকি? কি করছে সে আজকাল?'—কেষ্ট নকুড়-মামার আপন ভাগিনেয়, বেনারসের বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সে একটু পাগলাটে লোক, নকুড়-মামাকে বড়-একটা গ্রাহ্যই করে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে।

নকুড়-মামা কহিলেন—'সব বলছি। তুমি আগে আমার একটা কথার জবাব দাও দিকি। এই দার্জিলিংএ লোকে আসে কি করতে হ্যা? ঠাণ্ডা চাই? কলকাতায় তো আজকাল টাকায় এক মন বরফ মেলে, তারই গোটাকতক টালির ওপর অয়েলক্লথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সস্তায় শীতভোগ হয়। উঁচু চাই—তা না হ'লে শৌখিন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, দু-বেলা তালগাছে চড়লেই তো হয়। যত-সব হতভাগা—।'

এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল তখন বিশ্বকর্মা তাহাকে লইয়া একবার আচ্ছা করিয়া ময়দা-ঠাসা করিয়াছিলেন। তাঁর দশ আঙুলের গাঁট্টার ছাপ এখনও রহিয়া গিয়া স্থানে স্থানে পর্বত উপত্যকা নদী জলধি সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বকর্মার একটি বিরাট চিমটির ফল এই হিমালয় পর্বত। নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,—ভগবানের আশকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জিলিং-এ বাসা বাঁধিয়াছে। নকুড়-মামা ধর্মভীরু লোক, অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।

আমি বলিলাম—'কি জানেন নকুড়-মামা, কষ্ট পাবার যে আনন্দ, তাই লোকে আজকাল পয়সা খরচ ক'রে কেনে। অমৃত বোস লিখেছে—

ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

দার্জিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ ক'রে পাহাড় ডিঙোবার বদখেয়াল হয়েছে। তবে এইটুকু আশার কথা—এখানে মাঝে মাঝে ধস নাবে।'

মামা ত্রস্ত হইয়া খাদের কিনারা হইতে সরিয়া রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রান্তে আসিয়া বলিলেন—'উচ্ছন্ন যাবে। এটা কি ভদ্দর লোকের থাকবার দেশ? যখন-তখন বৃষ্টি, বাসা থেকে বেরুলে তো দশ তলার ধাক্কা, দু-পা হাঁটো আর দম নাও। নাও সিঁড়ি নেই, হোঁচট খেলে তো হাড়গোড় চূর্ণ। চললে হাঁপানি, থামলে কাঁপুনি কেন রে বাপু?'

নকুড়-মামা চারিদিকে একবার ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সময়টা যদি সত্য ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগ হইত এবং মামা যদি মুনি-ঋষি বা ভস্মলোচন হইতেন: তবে এতক্ষণে সমস্ত দার্জিলিং শহর সাহারা মরুভূমি অথবা ছাইগাদা হইয়া যাইত। আমি বলিলাম—'তবে এলেন কেন?'

নকুড়। আরে এসেছি কি সাধে। কেষ্টার স্বভাব জানো তো? লেখাপড়া শিখলি, বে-থা কর্, বিষয়-আশয় দেখ্—রোজগার তো আর করতে হবে না। সে সব নয়। দিনকতক খেয়াল হ'ল, ছবি আঁকলে। তার পর আমসত্ত্বর কল ক'রে কিছু টাকা ওড়ালে। তার পর কলকাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দার হ'য়ে

একটা সমিতি করলে। তার পর বম্বে গেল, সেখান থেকে আমাকে এক আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। কি হুকুম? না এক্ষুনি দার্জিলিং যাও, মুন-শাইন ভিলায় ওঠ, আমিও যাচ্ছি, বিবাহ করতে চাই। কি করি, বড়লোক ভাগনে, সকল আবদার শুনতে হয়। এসে দেখি—মুন-শাইন ভিলায় নরক গুলজার। বরযাত্রীর দল আগে থেকে এসে ব'সে আছে। সেই কচি-সংসদ্,—কেষ্টা যার প্রেসিডেণ্ট।

আমি। পাত্রী ঠিক হয়েছে?

নকুড়। আরে কোথায় পাত্রী! এখানে এসে হয়তো একটা লেপচানী কি ভুটানী বিয়ে করবে।

আমি। কচি-সংসদের সদস্যরা কিছু জানে না?

নকুড়। কিচ্ছু না। আর জানলেই বা কি, তাদের কথাবার্তা আমি মোটেই বুঝতে পারি না, সব যেন হেঁয়ালি। তবে তারা খায়-দায় ভাল, আমার সঙ্গে তাদের

পেলব রায়

ঐটুকুই সম্বন্ধ। কেষ্টবাবাজী আজ বিকেলে পৌঁছবেন। সন্ধ্যেবেলা যদি এস, তবে সবই টের পাবে, সংসদের সঙেদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হবে।

কচি-সংসদের কথা পূর্বে শুনিয়াছি। এদের সেক্রেটারি পেলব রায় আমাদের পাড়ার ছেলে, তার পিতৃদত্ত নাম পেলারাম। বি· এ· পাস করিয়া ছোকরার কচি এবং মোলায়েম হইবার বাসনা হইল। সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি-টাইপিস্টের খোঁপার মতন মাথার দু-পাশ ফাঁপাইয়া দিল। তারপর মুগার পাঞ্জাবি গরদের চাদর, সবুজ নাগরা ও লাল ফাউন্টেন পেন পরিয়া মধুপুরে গিয়া আশু মুখুজ্যেকে ধরিল—ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে পেলারাম রায় কাটিয়া যেন পেলব রায় করা হয়। সার আশুতোষ এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন। পেলারাম পলাইয়া আসিল এবং বি· এ· ডিপ্লোমা বাক্সে বন্ধ করিয়া নিরুপাধিক পেলব রায় হইল। তারই উদ্যমে কচি-সংসদ্‌ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তবে যতদূর জানি কেষ্টই সমস্ত খরচপত্র যোগায়। এই কচি-সংসদের উদ্দেশ্য কি আমার ঠিক জানা নাই। শুনিয়াছি এরা যাকে তাকে মেম্বার করে না এবং নূতন মেম্বারের দীক্ষাপ্রণালীও এক ভয়াবহ ব্যাপার। গভীর পূর্ণিমা নিশীথে সমবেত সদস্যমণ্ডলীর করস্পর্শ করিয়া দীক্ষার্থী ষোলটি ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ষোল টিন সিগারেট পোড়ে এবং এনতার চা খরচ হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, মেঘও কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই মুন-শাইন ভিলায় যাইব বলিয়া নকুড়-মামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

গৃহিণী তিন ছড়া পাঁচ সিকা দামের চুনি-পান্নার মালা উপর্যুপরি গলায় পরিয়া বলিলেন— 'দেখ তো, কেমন মানাচ্ছে।'

আমি বলিলাম—'চমৎকার। যেন পরস্ত্রী।'

গৃহিণী। তুমি একটি ক্যাড। পরস্ত্রী না হ'লে বুঝি মনে ধরে না?

আমি। আরে চট কেন। পরকীয়াতত্ত্ব অতি উঁচুদরের জিনিস। তার মহিমা বোঝা যার তার কম্ম নয়, তবে যে নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রীর মতন নিত্য-নূতন—ধরি ধরি ধরিতে না পারি--দেখে, সে অনেকটা এগিয়েছে। রাধাকৃষ্ণই হচ্ছেন মডেল প্রেমিক। ফ্রয়েড বলেছেন—

গৃহিণী। ড্যাম ফ্রয়েড—অ্যান্ড রাধাকৃষ্ণ মাথায় থাকুন। আমাদের মতন মুখ্খু লোকের সীতারামই ভাল।

আমি। কিন্তু রাম যে সীতাকে দু-দুবার পোড়াতে চাইলেন তার কি?

গৃহিণী। সে ত লোকনিন্দেয় বাধ্য হ'য়ে। ত্রেতাযুগের লোকগুলো ছিল কুচুণ্ডে রাসকেল।

আমি। তা—তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে আবার বনে গেলেই পারতেন।

গৃহিণী। সেই আহ্লাদে প্রজারা যে রামকে ছাড়তে চাইলে না।

আমি। বাঃ, তুমি আমার চাইতে ঢের বড় উকিল। আমি তোমাকে রামচন্দ্রের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু ভাগ্যিস তিনি সীতার মতন বউ পেয়েছিলেন তাই

নিস্তার পেয়ে গেলেন। তোমার পাল্লায় পড়লে অযোধ্যা শহরটাকেই ফাঁসি দিতে হ'ত।

গৃহিণী। কেন, আমি কি শূর্পনখা না তাড়কা রাক্ষুসী?

আমি। সীতা ছিলেন গোবেচারী লক্ষ্মীমেয়ে। তোমার মতন আবদেরে নয়।

গৃহিণী। সোনার হরিণ কে চেয়েছিল মশায়? কত ওজন তার খোঁজ রাখ? যদি ফাঁপা হয় তবু পাঁচ হাজার ভরি।

আমি। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারই জিত। আর শুনেছ, কেষ্ট যে এখানে বিয়ে করতে আসছে। সেই কাশীর কেষ্ট।

গৃহিণী। হুরে! ভাগ্যিস খানকতক গহনা এনেছি। কিন্তু আশ্বিন মাসে লগ্ন কই?

আমি। প্রেমের তেজ থাকলে লগ্নে কি আসে যায়। তবে পাত্রীটি কে তা কেউ জানে না। হয়তো এখনও পাত্রীই স্থির হয় নি, যদিও বরযাত্রীর দল হাজির।

গৃহিণী। গ্যাড! শুনেছিলুম কেষ্টর বাপের ইচ্ছে ছিল টুনি-দিদির ননদের সঙ্গে কেষ্টর বিয়ে দিতে। সে মেয়ে তো এখানেই আছে, আর বড়-সড়ও হয়েছে। তারও বাপ-মা নেই, তার দাদা—টুনি-দির বর ভুবনবাবু—তিনিই এখন অভিভাবক।

আমি। তা বলতে পারি না। কেষ্টর মতিগতি বোঝা শিবের অসাধ্য। যাই হ'ক, সন্ধ্যার সময় একবার কেষ্টর বাসায় যাব।

মনোহারিণী সন্ধ্যা। জনবিরল পথ দিয়া চলিয়াছি। শহরের সর্বত্র—উপরে, আরও উপরে, নীচে, আরও নীচে—স্তরে স্তরে অগণিত দীপমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু-ধারে ঝোপে জঙ্গলে পাহাড়ী ঝিঁঝির অলৌকিক মূর্ছনা ষড়্জ হইতে নিষাদে লাফাইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কুয়াশার চিহ্নমাত্র নাই। ঐ মুন-শাইন ভিলা।

কিসের শব্দ? দার্জিলিং শহরে পূর্বে শিয়াল ছিল না। বর্ধমানের মহারাজা যে-কটা আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তারা কি মুন-শাইন ভিলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে? না, শিয়াল নয়, কচি-সংসদ্ গান গাহিতেছে। গানের কথা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে আন্দাজে উপলব্ধি করিলাম, এক অচেনা অজানা অচিন্ত্যনীয় অরক্ষণীয়া বিশ্ব-তরুণীর উদ্দেশে কচি-গণ হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতেছে। হা নকুড়-মামা, তোমার কপালে এই ছিল?

আমাকে দেখিয়া সংসদ্ গান বন্ধ করিল। মামা ও কেষ্টকে দেখিলাম না। কেষ্ট আজ বিকালে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কোথায় উঠিয়াছে কেহ জানে না। শীঘ্রই সে মুন-শাইন ভিলায় আসিবে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পেলব রায় আমাকে খাতির করিয়া বসাইল এবং সংসদের অন্যান্য সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, যথা—

শিহরন সেন
বিগলিত ব্যানার্জি
অকিঞ্চিৎ কর

হুতাশ হালদার
দোদুল দে
লালিমা পাল (পুং)

এদের নাম কি অন্নপ্রাশনলব্ধ না সজ্ঞানে স্বনির্বাচিত? ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু চক্ষুলজ্জা বাধা দিল। লালিমা পাল মেয়ে নয়। নাম শুনিয়া অনেকে ভুল করে, সেজন্য সে আজকাল নামের পর 'পুং' লিখিয়া থাকে।

হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া নকুড়-মামা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর পিছনে ও কে? এই কি কেষ্ট? আমি একাই চমকিত হই নাই, সমগ্র কচি-সংসদ্ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। হুতাশ বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ, সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে,—সে আঁতকাইয়া উঠিল।

কেষ্টর আপাদমস্তক বাঙালীর আধুনিক বেশবিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তার মাথার চুল কদম্বকেশরের মতন ছাঁটা, গোঁফ নাই কিন্তু ঠোঁটের নীচে ছোট একগোছা দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট, কোমরে বেল্ট, মালকোঁচা-মারা বেগনী রঙের ধুতি, পায়ে পট্টি ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোঁতকা, পিঠে ক্যাম্বিসের ন্যাপস্যাক স্ট্রাপ দিয়া বাধা।

আমিই প্রথমে কথা কহিলাম—'কেষ্ট, একি বিভীষিকা?'

কেষ্ট বলিল—'প্রথমটা তাই মনে হবে, কিন্তু যখন বুঝিয়ে দেব তখন বলবেন হাঁ কেষ্ট ঠিক করেছে। ব্রজেন-দা, জীবনটা ছেলেখেলা নয়, আর্ট অ্যান্ড এফিশেন্সি।'

আমি। কিন্তু চেহারাটা অমন করলে কেন?

কেষ্ট। শুনুন। মানুষের চুলটা অনাবশ্যক, শীততাপ নিবারণের জন্যে যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকু রেখেছি। এই যে দেখছেন দাড়ি, একে বলে ইম্পিরিয়াল, এর উদ্দেশ্য নাকটা ব্যালান্স করা। আপনারা সাদা ধুতির ওপর ঘোর রঙের জামা পরেন —অ-ফুল। তাতে চেহারাটা টপ-হেভি দেখায়। আমার পোশাক দেখুন—প্লাম ভায়োলেট অ্যান্ড সেজ-গ্রীন, হোয়াইট স্পট্স—কলার কনট্রাস্ট অ্যান্ড হারমনি। এইবার পাছাপাড় হাফপ্যাণ্ট ফরমাশ দিয়েছি, তাতে ওয়েস্ট-লাইন আরও ইমপ্রুভ করবে। এই যে দেখছেন লাঠি, এতে বাঘ মারা যায়। এই যে দেখছেন পিঠের ওপর বোঁচকা, এতে পাবেন না এমন জিনিস নেই। আমি স্বাবলম্বী, স্বয়ংসিদ্ধ, বেপরোয়া।

এই পর্যন্ত বলিয়া কেষ্ট দুই পকেট হইতে দুই প্রকার সিগারেট বাহির করিল এবং যুগপৎ টানিতে টানিতে বলিল—'পারেন এ রকম? একটা ভার্জিনিয়া একটা টার্কিশ। মুখে গিয়ে ব্লেন্ড হচ্ছে।'

নকুড়-মামা চক্ষু মুদিয়া অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষবৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অভ্যন্তরে বিস্ময় ও ক্রোধ ধিকিধিকি জ্বলিতেছে।

পেলব রায় বলিল—'কেষ্টবাবু, আপনি না কচি-সংসদের সভাপতি? আপনি শেষটায় এমন হলেন?'

কেষ্ট। কচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাকবার সময় হয়েছে।

আমি। নিশ্চয়ই, নইলে দরকচা মেরে যাবে। যাক ওসব কথা,—কেষ্ট, তুমি নাকি বে করবে?'

কেষ্ট। সেই পরামর্শ করতেই তো আসা। আপনিও এসেছেন, খুব ভালই হয়েছে। প্রথমে আমি প্রেম সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই।

আমি। নকুড়-মামা, আপনি ওপরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন—আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। যা স্থির হয় পরে জানাব এখন। তার পর কেষ্ট, প্রেম কি প্রকার?—একটু চা হ'লে যে হ'ত।

পেলব হাঁকিল—'বোদা—বোদা—।' বোদা বলিল—'জু।'

বোদা কেষ্টর চাকর, নেপালী ক্ষত্রিয়। তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায় যে সে চন্দ্রবংশাবতংস। পেলব তাহাকে দশ পেয়ালা চা আনিতে বলিল।

এই কি কেষ্ট?

কেষ্ট বলিতে লাগিল—'প্রেম সম্বন্ধে লোকের অনেক বড় বড় ধারণা আছে। চণ্ডীদাস বলেছেন—নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কানুর প্রেম। রাশিয়ান কবি ভড্‌কাউইস্কি বলেন—প্রেম একটা নিকৃষ্ট নেশা। মেট্‌স্নিকফ বলেন—প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আরও উপকারী। মাদাম দে সেইয়াঁ বলেন—প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যায়। ওমর খায়য়াম লিখেছেন—প্রেম চাঁদের শরবত, কিন্তু তাতে একটু শিরাজী মিশুতে হয়। হেনরি-দি-এইট্‌থ বলেছিলেন,—প্রেম অবিনশ্বর, একটি প্রেমপাত্রী বধ করলে পর পর আর দশটি এসে জোটে। ফ্রয়েড বলেন—প্রেম হচ্ছে পশু-ধর্মের ওপর সভ্যতার পলেস্তারা। হ্যাভেলক এলিস বলেন—'

আমি। ঢের হয়েছে। তুমি নিজে কি বল তাই শুনতে চাই।

কেষ্ট। আমি বলি—প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়।

কচি-সংসদ্ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিল! হতাশ বুকে হাত দিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল—'ব্যথা, ব্যথা।'

কেষ্ট বলিল—'হুঁতো, অমন করছিস কেন রে? বেশী সিগারেট খেয়েছিস বুঝি? আর খাস নি?'

সমগ্র কচি-সংসদ্ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল

লালিমা পালের গলা হইতে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ নির্গত হইল—জাপানী ঘড়ি বাজিবার পূর্বে যে-রকম করে সেই প্রকার। তার গলাটা স্বভাবতঃ একটু শ্লেষ্মা-জড়িত। কলিকাতায় থাকিতে সে কোকিলের ডিমের সঙ্গে মকরধ্বজ মাড়িয়া খাইত, কিন্তু এখানে অনুপান অভাবে ঔষধ বন্ধ আছে। কেষ্ট তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল—'নেলো, তোর যদি প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলবার থাকে তো বল্ না।'

লালিমা বলিল—'আমার মতে প্রেম হচ্ছে একটা—একটা—একটা—'

আমি সজেস্ট করিলাম—'ভূমিকম্প।'

কেষ্ট। এগ্‌স্যাক্টলি। প্রেম একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়াগ্রা-প্রপাত, আকস্মিক বিপদ—যাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

লালিমা আর একবার বাজিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তার প্রতিবাদ নিষ্ফল জানিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল।

আমি বলিলাম—'তবে তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? কত টাকা পাবে হে?"

কেষ্ট। এক পয়সাও নেব না। আমি বিবাহ করতে চাই জগতকে একটা আদর্শ দেখাবার জন্যে। জগতে দু-রকম বিবাহ চলিত আছে। এক হচ্ছে—আগে বিবাহ, তার পরে প্রেম, যেমন সেকেলে হিঁদুর। আর এক রকম হচ্ছে—আগে প্রেম, তার পর বিবাহ, অর্থাৎ কোর্টশিপের পর বিবাহ। আমি বলি—দু-ই ভুল। আগে বিবাহ হ'লে পরে যদি বনিবনা না হয়, তখন কোথা থেকে প্রেম আসবে? আর—আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এও সমান খারাপ, কারণ কোর্টশিপের সময় দু-পক্ষই প্রেমের লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাখে। তার পর বিবাহ হ'য়ে গেলে যখন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন টু লেট।

আমি। ওসব তো পুরনো কথা বলছ। তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও তাই বল!

কেষ্ট। আমার সিস্টেম হচ্ছে—প্রেমকে একদম বাদ দিয়ে কোর্টশিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাকলেই লুকোচুরি আসবে। চাই—দু-জন নির্লিপ্ত সু-শিক্ষিত নরনারী, আর একজন বিচক্ষণ ভুক্তভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি—যিনি নানা বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত বেশ করে মিলিয়ে দেখবেন। আমি একটা লিস্ট করেছি। এতে আছে—বেশভূষা, আহার্য, শয্যা, পাঠ্য, কলাচর্চা, বন্ধু-নির্বাচন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি তিরেনব্বইটি অত্যন্ত দরকারী বিষয়, যা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর হরদম মতভেদ হয়ে থাকে। প্রথমেই যদি এইসব মোকাবেলা হ'য়ে যায় এবং অধিকাংশ বিষয়ে দু-পক্ষের এক মত হয়, আর বাকী অল্পস্বল্প বিষয়ে একটা রফা করা চলে, তা হ'লে পরে গোলযোগের ভয় থাকবে না। কিন্তু খবরদার, গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে, তা হ'লেই সব ভণ্ডুল হবে। শেষে যত খুশি প্রেম হ'ক তাতে আপত্তি নেই। এতদিন চলছিল—কোর্টশিপ, আর আমার সিস্টেম হচ্ছে—হাইকোর্টশিপ।

আমি। কোর্ট-মার্শাল বললে আরও ঠিক হয়। সিস্টেম তো বুঝলুম, কিন্তু এমন পাত্রী কে আছে যে তোমার এই এক্সপেরিমেন্টে রাজী হবে? তবে তুমি যে প্রেমের ভয় করছ সেটা মিথ্যে। তোমার ঐ মূর্তি দেখলে প্রেম বাপ বাপ ক'রে পালাবে।

কেষ্ট। পাত্রী আমি আজ ঠিক ক'রে এসেছি।

আমি। কে সেই হতভাগিনী?

কেষ্ট। ভুবন বোসের ভগ্নী, পদ্মমধু বোস।

আমি। আরে! আমাদের টুনি-দিদির ননদ? তাই বল। গিন্নী তা হ'লে ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু শুনলুম তোমাদের বিয়ের কথা নাকি আগেই একবার হয়েছিল। এতে কেস প্রেজুডিস্‌ড হবে না?

কেষ্ট। মোটেই না। আমরা দু-পক্ষই নির্বিকার। ব্রজেন-দা, আপনাকেই মধ্যস্থ হ'তে হবে কিন্তু। আপনার লিগাল ম্যাট্রিমনিয়াল দু-রকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভাল ক'রে জেরা করতে পারবেন।

আমি। রাজী আছি, কিন্তু মেয়েটা আমার ওপর না চটে।

কেষ্ট। কোন ভয় নেই, পদ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক।

আমি। লোকটি তো বুদ্ধিমান্, কিন্তু মেয়েটি কেমন?

কেষ্ট। মজবুত ব'লেই তো বোধ হয়। সাত মাইল হাঁটতে পারে, দু-ঘণ্টা টেনিস খেলতে পারে, মাস্কুলার ইনডেক্স খুব হাই, ফেটিগ-কোয়েফিশেণ্ট বেশ লো। সেলাই জানে, রান্না জানে, লজিক জানে, বাজে তর্ক করে না, ইকনমিক্স জানে, গান গাইবার সময় বেশী চেঁচায় না। তা হ'লে কাল সন্ধ্যেবেলা ভুবনবাবুর বাড়ি ঠিক যাবেন—লাভলক রোড, মডলিন কটেজ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহাভিমুখ হইলাম। মুন-শাইন ভিলার গেট পার হইতেই একটা কোলাহল কানে আসিল। আন্দাজে বুঝিলাম কচি-সংসদের রুদ্ধ বেদনা মুখরিত হইয়া কেষ্টকে গঞ্জনা দিতেছে। আমি আর দাঁড়াইলাম না।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী মত প্রকাশ করিলেন—'রিপিং! পারসী থিয়েটারের চাইতেও ভাল। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যদি পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হয় তাতেও রাজী আছি।'

আমি বলিলাম—'কিন্তু তোমাকে তো শুনতে দেবে না। হাইকোর্টশিপ গোপনে হয়, ওইটুকুই সাধারণ কোর্টশিপের সঙ্গে মেলে। ঘরে থাকব শুধু আমি, কেষ্ট আর পদ্ম।'

গৃহিণী। আড়ি পাতব।

আমি। তার দরকার হবে না। সব কথাই প'রে শুনতে পাবে। আমার যে কান তাহা তোমার হউক।

গৃহিণী। যাই হ'ক আমিও যাব।

আমি। কিন্তু পরের ব্যাপারে তোমার ওরকম কৌতূহল তো ভাল নয়। ফ্রয়েড এর কি ব্যাখ্যা করেন জান?

গৃহিণী। খবদ্দার, ও মুখপোড়ার নাম ক'রো না বলছি।

অগত্যা দুজনেই টুনি-দিদির বাসায় চলিলাম।

ভুবনবাবু ও টুনি-দিদি—এ'রা যেন সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি। কর্তাটি কুঁড়ের সম্রাট, সমস্তক্ষণ ড্রেসিং গাউন পরিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়েন ও চুরুট ফোঁকেন। গিন্নীটি ঠিক উল্টা, অসীমশক্তিময়ী, অঘটনঘটনপটিয়সী, মাছ-কোটা হইতে গাড়ি রিজার্ভ করা পর্যন্ত সব কাজ নিজেই করিয়া থাকেন, কথা কহিবার ফুরসত নাই। তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা শেষ করিয়াই অতিথিসৎকারের বিপুল আয়োজন করিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। পদ্ম আসিয়া প্রণাম করিল।

খাসা মেয়ে। কেষ্টা হতভাগা বলে কিনা মজবুত! একি হাতুড়ি না হামান-দিস্তা? কচি-সংসদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কেউ নিরেট কচি থাকে, তবে সে কেষ্ট —যতই প্রেমের বক্তৃতা দিক। ঋষ্যশৃঙ্গের একটা শিং ছিল, কেষ্টর দুটো শিং। কিন্তু এই সুশ্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ মেয়েটি কেন এই গর্দভের খেয়ালে রাজী হইল? স্ত্রীজাতি বাঁদর-নাচ দেখিতে ভালবাসে। পদ্মর উদ্দেশ্য কি শুধু তাই? স্ত্রীচরিত্র বোঝা শক্ত। নাঃ, মনস্তত্ত্বের বইগুলা ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

হাইকোর্টশিপ আরম্ভ হইল। ঘরের পর্দা ভেদ করিয়া সুদূর রান্নাঘর হইতে

টুনি-দিদি ও আমার গৃহিণীর উচ্চ হাসি এবং কাটলেট-ভাজার গন্ধ আসিতেছে। আমি যথাসাধ্য গাম্ভীর্য সঞ্চয় করিয়া শুভকার্য আরম্ভ করিলাম—

'এই মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, অনুবাদী, সংবাদী, বিসংবাদী কে কে তা এখনও স্থির হয় নি। কিন্তু সেজন্য বিচার আটকাবে না, কারণ দুই সাক্ষী হাজির,—শ্রীমান্ কেষ্ট ও শ্রীমতী পদ্ম—'

কেষ্ট বলিল—'ব্রজেন-দা, আপনি এই গুরু বিষয় নিয়ে আর তামাশা করবেন না —কাজ শুরু করুন।'

আমি। ব্যস্ত হও কেন—, আগে যথারীতি সত্যপাঠ করাই।—শ্রীমান্ কেষ্ট, তুমি শপথ ক'রে বল যে তোমার মধ্যে পূর্বরাগের কোন কম্পোনেন্ট নেই। যদি থাকে তবে মকদ্দমা এখনই ডিসমিস হবে।

কেষ্ট। একদম নেই। পদ্ম যখন পাঁচ বছরের আর আমি যখন দশ বছরের, তখন ওকে যে-রকম দেখতুম এখনও ঠিক তাই দেখি। তবে আগে ওকে ঠেঙাতুম, এখন আর ঠেঙাই না।

আমি। শ্রীমতী পদ্ম, কেষ্টর প্রতি তোমার মনোভাব কি রকম তা জিজ্ঞেস ক'রে তোমার অপমান করতে চাই না। কেষ্টর মতিই হচ্ছে পূর্বরাগের অ্যান্টি-ডোট। কেষ্ট, এইবার তোমার সেই ফিরিস্তিটা দাও। বাপ! তিরেনব্বইটা আইটেম! বেশভূষা—আহার্য—শয্যা—পাঠ্য—এ তো দেখছি পাক্কা পনর দিন লাগবে। দেখ, আজ বরঞ্চ আমি গোটাকতক বাছা বাছা প্রশ্ন করি, যদি অবস্থা আশাজনক বোধ হয় তবে কাল থেকে সিস্টেম্যাটিক টেস্ট শুরু হবে। আচ্ছা, প্রথমে আহার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি—কারণ ওইটেই সবচেয়ে দরকারী, ফ্রয়েড যা-ই বলুন। কেষ্ট তুমি লঙ্কা খাও?

কেষ্ট। ঝাল আমার মোটেই সহ্য হয় না।

আমি। পদ্ম কি বল?

পদ্ম। লঙ্কা না হ'লে আমি খেতেই পারি না।

আমি। ব্যাড। প্রথমেই ঢেরা পড়ল। স্বামী-স্ত্রীর তো ভিন্ন হেঁশেল হ'তে পারে না। রফা করা চলে কিনা পরে স্থির করা যাবে। জলে লঙ্কা সেদ্ধ ক'রে দুজনকে খাইয়ে দেখে এমন একটা পার্সেন্টেজ ঠিক করতে হবে যা দু-পক্ষেরই বরদাস্ত হয়। আচ্ছা—তোমরা চায়ে কে ক চামচ চিনি খাও?

কেষ্ট। এক।

পদ্ম। সাত।

আমি। ভেরি ব্যাড। আবার ঢেরা পড়ল।

কেষ্ট। আমি মেরে কেটে তিন চামচ অবধি উঠতে পারি। পদ্ম, তুমি একটু নাবো না।

আমি। খবরদার, সাক্ষী ভাঙাবার চেষ্টা ক'রো না। যা জিজ্ঞাসা করবার আমিই করব। আচ্ছা—কেষ্ট, তুমি কি-রকম বিছনা পছন্দ কর? নরম না শক্ত?

কেষ্ট। একটু শক্ত রকম, ধরুন দু-ইঞ্চি গদি। বেশী নরম হ'লে আমার ঘুমই হয় না।

পদ্ম। আমি চাই তুলতুলে।

আমি। ভেরি ভেরি ব্যাড। এই ফের ঢেরা দিলুম। আচ্ছা—কেষ্ট, পদ্মর চেহারাটা তোমার কি-রকম পছন্দ হয়?

কেষ্ট। তা মন্দ কি।

আমি সাক্ষীবিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম—'ওসব ভাসা ভাসা জবাব চলবে না, ভাল ক'রে দেখ তার পর বল।'

পদ্ম লাল হইল। কেষ্ট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একটু বোকা-হাসি হাসিয়া বলিল—'খাখ্-খাসা চেহারা। এঃ, পদ্ম আর সে পদ্ম নেই, এক্কেবারে—'

আমি। বস্ বস্—বাজে কথা ব'লো না। পদ্ম, এবারে তুমি কেষ্টকে দেখে বল।

পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কেষ্টর প্রতি চকিত দৃষ্টি হানিয়া বলিল—'যেন একটি সঙ!'

কেষ্ট। তা—তা আমি না-হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না-হয় ফেলে দেব। আচ্ছা, এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলাম—এইবার দেখ তো পদ্ম।

পদ্ম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

'এইবার দেখতো'

আমি বলিলাম—'হোপলেস। আপত্তির প্রতিকার হ'তে পারে, কিন্তু বিদ্রূপের ওষুধ নেই।'

কেষ্ট একটু গরম হইয়া বলিল—'আপনিই তো যা-তা রিমার্ক ক'রে সব গুলিয়ে দিচ্ছেন।'

আমি। আচ্ছা বাপু, তুমি নিজেই না-হয় জেরা কর।

কেষ্ট প্রত্যালীঢ়পদে বসিয়া আস্তিন গুটাইয়া বলিল—'পদ্ম, এই দেখ আমার হাত। একে বলে বাইসেপ্স—এই দেখ ট্রাইসেপ্স। এইরকম জবরদস্ত গড়ন তোমার পছন্দ হয়, না ব্রজেন-দার মতন গোলগাল নাদুস-নুদুস চাও? তোমার মতামত জানতে পারলে আমি না-হয় আমার আদর্শ সম্বন্ধে ফের বিবেচনা করব।'

পদ্ম। তোমার চেহারা তুমি বুঝবে—আমার তাতে কি। আমি তো আর তোমার দরোয়ান রাখছি না।

কেষ্ট। আচ্ছা, তোমার হাতটা দেখি একবার—কি রকম পাঞ্জার জোর—

কেষ্ট খপ করিয়া পদ্মর পদ্মহস্ত ধরিল। আমি বলিলাম—'হাঁ হাঁ—ও কি! সাক্ষীর ওপর হামলা! ওসব চলবে না—আমার ওপর যখন বিচারের ভার তখন যা করবার আমিই করব। তুমি ওই ওখানে গিয়ে বস।'

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল—'বেশ তো, আপনিই ফের কোশচেন করুন।'

আমি। আর দরকার নেই। তোমাদের মোটেই মতে মিলবে না, রফা করাও চলবে না। আমি এই হুকুম লিখলুম—napoo, nothing doing। কেস এখন মুলতবী রইল। এক বৎসর নিজের নিজের মতামত বেশ ক'রে রিভাইজ কর, তার পর আবার অত্র আদালতে হাজির হইবা।

কেষ্ট এবার চটিয়া উঠিল। বলিল—'আপনি আমার সিষ্টেম কিচ্ছু বুঝতে পারেন নি। আপনি যা করলেন সে কি একটা টেস্ট হ'ল?—শুধু ইয়ারকি। আপনাকে মধ্যস্থ মানাই ঝকমারি হয়েছে।'

আমিও খাপ্পা হইয়া বলিলাম—'দেখ কেষ্ট, বেশী চালাকি ক'রো না। আমি একজন উকিল, বার বৎসর প্র্যাকটিস করেছি, পনর বৎসর হ'ল বিবাহ করেছি, ঝাড়া একটি মাস সাইকলজি পড়েছি। কার সঙ্গে কার মতে মেলে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর—তুমি তো নির্বিকার, তোমার অত রাগ কেন? দেখ দিকি, পদ্ম কেমন লক্ষ্মীমেয়ে, চুপটি ক'রে বসে আছে।'

কেষ্ট গজগজ করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ ঘরের পর্দা ঠেলিয়া টুনি দিদির ছোট খুকী প্রবেশ করিল।

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম—'নারী, তুমি কি চাও?'

খুকীর নারীত্বের দাবি অতি মহৎ এবং সমস্ত নারীসমাজের অনুধাবনযোগ্য। বলিল—'খাবেন চলুন, লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

কেষ্ট কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিল না, ভাল করিয়া খাইলও না। আহারান্তে আমি একাই নিজের বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণী আজ এখানেই রাত্রি যাপন করিবেন।

পরদিন বেলা দশটার সময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সভয়ে দেখিলাম তিনি কম্বলের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে নড়িয়া উঠিতেছেন এবং অস্ফুট শব্দ করিতেছেন।

বলিলাম—'ফিক ব্যথাটা আবার ধরেছে বুঝি? ডাক্তার দাসকে ডাকব?'

গৃহিণী অতি কষ্টে বলিলেন—'না, কিছু দরকার নেই, ও আপনিই সেরে যাবে। হুঃ হুঃ হিঃ।'

হিস্টিরিয়া নাকি? ও উৎপাত তো ছিল না, নিশ্চয় বেচারা কল্যকার ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমার মতলব তো জানে না। মেয়েরা চায় রাতারাতি বিবাহটা স্থির হইয়া যাক। আরে অত ব্যস্ত হইলে কি চলে! কেষ্ট সবে ব'ড়শি গিলিয়াছে, এখন তাকে আরও দিনকতক খেলাইতে হইবে।

বৈকালে মুন-শাইন ভিলায় যাইলাম—উদ্দেশ্য কেষ্টকে একটু ঠাণ্ডা করা। কিন্তু কেষ্টর দেখা পাইলাম না, মামাও নাই। কচি-সংসদের সভ্যগণ নিজ নিজ খাটে শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস,—নিশ্চয় একটা বড়-রকম ব্যথা পাইয়াছে।

বোদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবু কাঁহা?'

বোদার বদনচক্রে দর্শন, নিঃশ্বাস ও বাক্যনিঃসরণের জন্য যে কয়টি ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহা বিস্ফারিত হইল। বলিল—'বাবু বাগা।'

আঁ? কেষ্টবাবু ভাগা! কাঁহা ভাগা? নিশ্চয় ভুবনবাবুর বাড়িতে গিয়া হোগা।

'বাবু বাগ গিয়া'

'ভুবনবাবু বাগ গিয়া! উনকি বিবি বাগ গিয়া। উনকি কোকী বাগ গিয়া। কোকীকা গোড়া বাগ গিয়া। গোরে-সি মিসিবাবা যো থি সো বি বাগ গিয়া।' কেষ্ট পালাইয়াছে। ভুবনবাবু, তাঁহার বিবি, তাঁহার খুকী, খুকীর ঘোড়া এবং ফরসা-মতন মিসিবাবা—অর্থাৎ পদ্ম—সকলেই পালাইয়াছে। নকুড়-মামা বোধ হয় খোঁজে বাহির হইয়াছেন। কচি-সংসদ্ কিছুই জানে না, জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

গৃহিণীর কাণ্ড মনে পড়িল। ফিক ব্যথাও নয় হিস্টিরিয়াও নয়—শুধু হাসি চাপিবার চেষ্টা। তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিলাম।

বলিলাম—'তুমিই যত নষ্টের গোড়া।'

গৃহিণী। আহা, কি আমার কাজের লোক! নিজে কিছুই করতে পারলেন না, এখন আমার দোষ।

আমি। তার পর ব্যাপারটা কি বল দিকি?

গৃহিণী প্রথমে একচোট হাসিয়া গড়াইয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—'তুমি তো রাত সাড়ে দশটায় ফিরে গেলে। টুনি-দিদি আর আমি গল্প করতে লাগলুম —সে কত সুখ-দুঃখের কথা। রাত বারটার সময় দেখি—কেষ্ট টিপিটিপি আসছে। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বললে—কেষ্ট, কি হয়েছে? কেষ্ট বললে, পদ্মর সঙ্গে বে না হ'লে সে আর এ প্রাণ রাখবে না, তার আর তর সইছে না, হয় পদ্ম—নয় কি একটা অ্যাসিড। আমি বললুম—তার আর চিন্তা কি, অ্যাসিড ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, আর পদ্ম তো মজুতই আছে। আগে সকাল হ'ক তারপর যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কেষ্ট বললে—সে এক্ষুনি তার সঙের সাজ ফেলে দিয়ে ভদ্দর লোক সাজবে, কিন্তু অত লাফালাফির পর পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? টুনি-দি বললে—কুছ পরোয়া নেই, কালকের মেলেই কলকাতায় পালিয়ে চল, গিয়েই বে দেব। পদ্ম বিগড়ে বসল। টুনি-দি বললে নে, নেঃ—নেকী। টুনি-দিকে জান তো, তার অসাধ্য কাজ নেই। সেই রাত্রেই মশাই মোট বাঁধা হ'য়ে গেল—এক-শ তেষট্টিটা লাগেজ। তারপর আজ সকালে তাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এখানে চ'লে এলুম।'

বিবাহের পর দেড় মাস কেষ্ট আমার সঙ্গে লজ্জায় দেখা করে নাই.—সবে কাল আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করিয়াছি এবং মনস্তত্ত্ব হইতে নজির দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে তাহার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। কেষ্টর মনের আড়ালে যে আর একটা উপমন এতদিন ছাই-চাপা ছিল তাহারই ভূমিকম্পের ফলে সে বাঁদর নাচিয়াছে।

কচি-সংসদ্ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কেষ্ট আবার একটা নূতন ক্লাব স্থাপন করিয়াছে—হৈহয় সংঘ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হৈহয় ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার—সস্ত্রীক আমি ও কেষ্ট। এই বড়দিনের বন্ধে আমরা হাওড়া হইতে পেশাওআর পর্যন্ত হইহই করিতে যাইব।

হনুমানের স্বপ্ন

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ্য শান্তির ও স্বাস্থ্যের নিলয় হইল, প্রজার গৃহে ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল, তস্কর, বঞ্চক ও পাণ্ডিতমূর্খগণ বৃত্তিনাশহেতু পলায়ন করিল। দেশে আর্ত পীড়িত নাই, ধর্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদী নাই, কারাগার জনশূন্য। ভিষগ্‌গণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন, বিচারকগণ পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে রত হইয়া অবসরবিনোদন করিতে লাগিলেন।

হনুমান এখন অযোধ্যাতেই বাস করেন। রাম তাঁহার জন্য এক সুরম্য কদলী-কাননে সপ্ততল কাষ্ঠভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভক্ত প্রজাবর্গের সমাদরে সর্বাংগীণ পরিপুষ্টি লাভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। অযোধ্যাবাসী উদ্‌বিগ্ন হইয়া দেখিল পবননন্দন দিন দিন কৃশ হইতেছেন, তাঁহার কান্তি ম্লান হইতেছে, তাঁহার আর তেমন স্ফূর্তি নাই। রামের আদেশে রাজবৈদ্যগণ হনুমানের চিকিৎসা করিলেন, কিন্তর অরিষ্ট মোদক রসায়নাদির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কোনও উপকার দর্শিল না। ভিষগ্‌গণ হতাশ হইয়া বলিলেন, মহাবীরের যে ব্যাধি তাহা আধ্যাত্মিক, ঔষধে সারিবার নয়। অগত্যা বশিষ্ঠ ঋষি হনুমানের মংগলকামনায় এক বিরাট যজ্ঞের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজ্ঞী সীতা হনুমানকে রাজান্তঃপুরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস, তোমার কি হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার মাতৃতুল্য, বলিতে সংকোচ করিও না।'

মহাবীর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাম গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিলেন, তাহার পর দক্ষিণ গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিলেন। তদনন্তর মস্তক নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—'মাতঃ, আমার গোপন কথা যদি নিতান্তই শুনিতে চাও তবে না বলিয়া উপায় নাই। কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে পিতৃগণকে দেখিয়াছি। তাঁহারা সুমেরুশিখরে সারি সারি পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন এবং বিষণ্ণবদনে নিজ নিজ উদরে হাত বুলাইতেছেন। এই দুঃস্বপ্নের অর্থ আমি বশিষ্ঠপুত্র বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে মহাবীর, ও কিছু নয়, তোমার পিতৃগণ ক্ষুধিত হইয়াছেন, তুমি কদলী দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ কর এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূরিদক্ষিণা দাও। আমি বামদেবের উপদেশ পালন করিলাম, কিন্তু তাহার পর আবার পিতৃগণ আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল যে তাঁহারা ক্ষণিক ব্যবস্থায় তৃপ্ত হইবেন না। আমার মৃত্যুর পর কে তাঁহাদিগকে পিণ্ড দিবে? লোকে যে-বয়সে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করে, আমি সেই বয়সে সুগ্রীবের অনুচর হইয়া বানপ্রস্থে কালহরণ করিয়াছি। এখন প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়াছেন, রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে, আমারও অবসর মিলিয়াছে। কিন্তু আমি এখন বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপস্থিত, এখন যদি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে চাই তবে লোকে আমাকে ধিক্কার দিবে! হা, আমার পিতৃঋণ শোধের কি উপায় হইবে? হে দেবী, এই দুশ্চিন্তা আমাকে অহরহ দহন করিতেছে, আমি নিরন্তর পিতৃগণের ম্লানমুখ ও শূন্য উদর দেখিতে পাইতেছি, আমার ক্ষুধা নাই নিদ্রা নাই শান্তি নাই।' এই বলিয়া হনুমান নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

হনুমানের বচন শুনিয়া দেবী জানকী ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন—'হে বীর-শ্রেষ্ঠ, এজন্য আর চিন্তা কি? তুমি লোকলজ্জায় অভিভূত হইও না, এই দণ্ডে বিবাহ করিয়া পিতৃগণকে নিশ্চিন্ত কর। তোমার কী এমন বয়স হইয়াছে? আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় তোমার অপেক্ষাও অধিক বয়সে ভরতজননীকে গৃহে আনিয়াছিলেন। আমি আমার সখীগণকে ডাকিয়া আনিতেছি, তাহারা সকলেই সুরূপা সুশীলা সদ্বংশীয়া। তোমার যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে বরণ কর। হে কপিপ্রবর, আমি নিশ্চয় কহিতেছি এই অযোধ্যায় এমন কন্যা নাই যে তোমাকে পতিরূপে পাইয়া ধন্য হইবে না। তুমি তোমার জাতির জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। আমি অনুরোধ করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ উপনয়ন সংস্কার দ্বারা তোমাকে ক্ষত্রিয় বানাইয়া দিবেন। অথবা যদি মানবীতে তোমার অভিরুচি না থাকে, তবে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর এবং একটি পরমা সুন্দরী বানরীর পাণিগ্রহণ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় ফিরিয়া আইস: তোমার পত্নীর নাম যাহাই হউক আমি তাহাকে হনুমতী বলিব এবং এই রাজপুরীর বধূগণমধ্যে সাদরে গ্রহণ করিব।'

তখন হনুমান প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন—'জনকনন্দিনী, তোমার জয় হউক। আমি কৌলীন্য ভঙ্গ করিব না, বানরীই বিবাহ করিব এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া অদ্যই কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা করিব।'

হনুমান নানা গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ, সূর্যাস্তের বিলম্ব নাই। মহাবীর এক বিশাল শাল্মলিতরুর শাখায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন নিকটে কোথাও

রাত্রি বাসের উপযুক্ত আশ্রয় আছে কিনা। সহসা অদূরে একটি সুবৃহৎ পর্ণগৃহ নয়নগোচর হইল। হনুমান বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহার অভ্যন্তর পরিপাটীরূপে সজ্জিত। ভূমিতে কোমল তৃণরাশির উপর মসৃণ মৃগচর্মের আস্তরণ, এক কোণে স্তূপীকৃত সুপক্ক আম্র-পনস-রম্ভাদি ফল, অন্য কোণে চন্দনকাষ্ঠের মঞ্চের উপর রাজোচিত বসন উত্তরীয় উষ্ণীষ প্রভৃতি পরিচ্ছদ এবং বিবিধ প্রসাধনদ্রব্য, প্রাচীরগাত্রে লম্বিত একটি সুরম্য পরিবাদিনী বীণা।

হনুমান সমস্ত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন—'অহো, নিশ্চয়ই স্বর্গস্থ পিতৃগণ আমার প্রতি স্নেহবশে এই উপহারসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত আমি এখনই এই পরিচ্ছদ ধারণ করিব এবং রাত্রিকালে এই উপাদেয় ভোজ্যসকল আহার করিব।'

এই বলিয়া হনুমান সেই বিচিত্র বসন উত্তরীয়াদি পরিধান করিলেন এবং মস্তকে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া অতিশয় শোভমান হইলেন। তাহার পর শয্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিলেন—'এখনও বেলা অবসান হয় নাই, ভোজনের বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আমি এই বীণা বাজাইয়া দেখি।'

মহাবীর সাবধানে বীণাটি পাড়িলেন, কিন্তু বাদ্যের উপক্রম করিতেই তাঁহার প্রবল অঙ্গুলিস্পর্শে সমস্ত তার ছিঁড়িয়া গেল। হনুমান বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'এই ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্র মাদৃশ বীরের অস্পৃশ্য।' তখন তিনি মৃগচর্মে শয়ান হইয়া ভাবী ভার্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কান্তা কেমন হইবে? তন্বী না স্থূলা, পীঙ্গলবর্ণা না রক্ত-কপিশপ্রভা, ধীরা না চপলা, কলকণ্ঠী না কর্কশনাদিনী? ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। হনুমান স্বগত কহিতে লাগিলেন—'অহোবত, আমি এ কী ঘোর কর্মে ব্যবসিত হইয়াছি! আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছি, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি। সাগরে অম্বরে পর্বতে অরণ্যে আমার অজ্ঞাত কিছু নাই। আমি সমরে অভিজ্ঞ, সংকটে ধীর, দেবচরিত্র কাকচরিত্র আমার নখদর্পণে। কিন্তু স্ত্রীজাতির রহস্য আমি কি-ই বা জানি! এই অদ্ভুত প্রাণীর গুম্ফ নাই শ্মশ্রু নাই বল নাই বুদ্ধি নাই। অথচ দেখ ইহারা শিশুকে স্তন্যদান করে, কিন্তু আমরা তাহা পারি না। ইহারা অকারণে হাস্য করে, অকারণে ক্রন্দন করে, তুচ্ছ মুক্তা প্রবাল ইহাদের প্রিয়, সন্তানপালন ও নিরর্থক বস্তুসংগ্রহই একমাত্র কার্য। ঈদৃশী কোমলাঙ্গী মসৃণবদনী পয়স্বিনী শিশুপালিনী ভার্যার সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব? যদি সে আমার প্রিয়কার্য করে তবে কি মস্তকে উত্তোলন করিয়া সমাদর করিব? যদি অবাধ্য হয় তবে কি চপেটাঘাতে বিনীত করিব? বানরধর্ম-শাস্ত্রে এবংবিধ শাসনের বিধান আছে বটে, কিন্তু মানবশাস্ত্র কি বলে?'

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সেই পর্ণগৃহের দ্বারদেশে এক সুদর্শন যুবা পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার বেশভূষা বহুমূল্য, স্কন্ধ হইতে শরাসন লম্বিত, পৃষ্ঠে তূণীর, এক হস্তে বাণবিদ্ধ দর্শাট তিত্তির পক্ষী, অন্য হস্তে একটি সদ্য আহৃত বৃহৎ মধুচক্র।

আগন্তুক হনুমানকে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন—'ওরে বানরাধম, তুই কোন্ সাহসে আমার রাজবেশ আত্মসাৎ করিয়া আমার শয্যায় শুইয়া আছিস? দাঁড়া, এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইতেছি।'

হনুমান কহিলেন—'ওহে বীরপুংগব, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। হঠকারিতা মূর্খের লক্ষণ,

ধীর ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য করেন। আমি রামদাস হনুমান, লোকে আমাকে মহাবীর বলে। ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।'

ওরে বানরাধম

তখন আগন্তুক সসম্ভ্রমে ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া কহিলেন—'অহো, আমার কি সৌভাগ্য যে শ্রীহনুমানের দর্শনলাভ করিলাম! মহাবীর, তুমি অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তুম্বদেশের অধিপতি, নাম চঞ্চরীক। তোমার যোগ্য সৎকার করি এমন আয়োজন আমার এই অরণ্যকুটীরে নাই। যদি কোনও দিন আমার রাজপুরীতে পদরেণু দাও তবেই আমার তৃপ্তি হইবে। হে অঞ্জনানন্দন, তুমি ঐ রমণীয় পরিচ্ছদ উষ্ণীষাদি খুলিয়া ফেলিতেছ কেন, উহাতে তোমাকে সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় দেখাইতেছে। আমি এই রজতময় দর্পণ ধরিতেছি একবার অবলোকন কর। তুমি অনুমতি দাও, আমি এই সুস্বাদু তিত্তিরমাংস অগ্নিপক্ক করিয়া দিতেছি। তুমি বুঝি নিরামিষাশী? তবে ঐ আম্র-পনস-রম্ভাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। হে মারুতি, বিমুখ হইও না, একবার মুখব্যাদান কর, আমি এই মধুচক্র তোমার বদনে নিংড়াইয়া দিই। তুমি বোধ হয় সংগীতচর্চা করিতেছিলে, তাই আমার বীণাটির এমন দশা হইয়াছে। হে মহাবীর, তুমি বুঝি কামুক ভাবিয়া উহাতে টংকার দিয়াছিলে?'

হনুমান কহিলেন,—'চণ্ডরীক, তোমার অভ্যর্থনায় আমি প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তুমি অধিক বাচালতা করিও না, আমার এই বজ্রমুষ্টি দেখিয়া রাখ, ইহা হঠাৎ ধাবিত হয়। এই পরিচ্ছদে আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তুমিই ইহা পরিধান করিও। আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইও না, যথাকালে তাহা হইবে। তোমার বীণা কোনও কর্মের নয়। দুঃখ করিও না, আমি উহাতে শণের রজ্জু লাগাইয়া দিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কি জন্য বিজন অরণ্যে এই কুটীর নির্মাণ করিয়াছ? যদি নরপতি হও, তবে তোমার গজ বাজী অন্যত্র সৈন্য দেখিতেছি না কেন? তোমার রথ সারথি কোথায়, বিদূষকই বা কোথায়?'

চণ্ডরীক কহিলেন—'হে বানরর্ষভ, আমি মনের দুঃখে একাকী অরণ্যবাস করিতেছি, এখন আমিই আমার রক্ষী, আমিই সারথি, আমিই বিদূষক। আমার কাহিনী অতি করুণ, শ্রবণ কর। আমার মহিষী পরমরূপবতী এবং অশেষগুণ-শালিনী, কিন্তু তাঁহাকে ঠিক পতিব্রতা বলিতে পারি না। একদা আমি তাঁহার এক সুন্দরী সখীর সহিত কিঞ্চিৎ রসচর্চা করিতেছিলাম, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া ফেলেন। এই তুচ্ছ কারণে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ক্রোধাগারে বসতি করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে এই অরণ্যে বাস করিতেছি এবং পশুপক্ষী মারিয়া বিরহযন্ত্রণা লাঘব করিতেছি। হে পবননন্দন, এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে এক ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল। শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন —অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ। শুনিয়াছি এই অরণ্যে মহাতপা লোমশ মুনি বাস করেন। নারীজাতিকে বশে রাখিবার উপায় তিনি সম্যক্ অবগত আছেন, কারণ তাঁহার একশত পত্নী। আমি স্থির করিয়াছি তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিব। আমার কথা সমস্ত বলিলাম, এখন তুমি কি জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ শুনিতে ইচ্ছা করি। রামচন্দ্র কি পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তোমার অনাদর করিয়াছেন?'

হনুমান কহিলেন—'সাবধান, তুমি রামনিন্দা করিও না। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছি, সেখানে দারপরিগ্রহ করিয়া বধূর সহিত অযোধ্যায় ফিরিব। তোমার উপর আমার প্রীতি জন্মিয়াছে, অতএব মনের কথা খুলিয়া বলি। হে চণ্ডরীক, আমি স্ত্রীতত্ত্ব অবগত নহি, কেবল পিতৃ-ঋণ পরিশোধের নিমিত্তই এই দুরূহ সংকল্প করিয়াছি। তোমার দাম্পত্যকাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে?'

চণ্ডরীক হাসা করিয়া কহিলেন—'হে হনুমন্, ভয় নাই। তুমি যখন গন্ধমাদন বহন করিয়াছ তখন ভার্যার ভারও বহিতে পারিবে। আমি তোমাকে সমস্তই শিখাইয়া দিব। সম্প্রতি কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। পুত্রার্থে ভার্যা করা অতি সহজ কর্ম, কিন্তু যদি প্রেমের জন্য ভার্যা করিতে হয় তবে স্ত্রীচরিত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। নিজস্ত্রী সলজ্জা হইবে এবং পরস্ত্রী নির্লজ্জা হইবে ইহাই রসজ্ঞজনের কাম্য। তোমার রামরাজ্যের কথা অবগত নহি, কিন্তু সংসারে এই শুভসমন্বয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব—'

হনুমান কহিলেন—'ওহে চণ্ডরীক, তুমি ক্ষান্ত হও। অগ্রে নিজ সমস্যার সমাধান কর তাহার পর আমাকে উপদেশ দিও। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন ভোজনের আয়োজন করিতে পার। কুটীরদ্বার বন্ধ করিয়া দাও, বনভূমির শীতবায়ু আর আমার তেমন সহ্য হয় না।'

চঞ্চরীক অর্গল বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন এবং ভোজনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা দ্বারে করাঘাত করিয়া কে বলিল—'ভো গৃহস্থ, অর্গল মোচন কর, আমি শীতার্ত ক্ষুধার্ত অতিথি।'

চঞ্চরীক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে এক শীর্ণকায় তপস্বী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার মস্তক জটামণ্ডিত, শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, দেহ লোমে সমাকীর্ণ।

চঞ্চরীক প্রণাম করিয়া কহিলেন—'তপোধন, আপনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি যে আপনি স্বনামধন্য লোমশ ঋষি। আপনার দর্শনলাভের জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছিলাম, আপনি বোধ হয় যোগবলে জানিতে পারিয়া কৃপাবশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তুম্বরাজ চঞ্চরীক, আর ইনি আমার পরমবন্ধু জগদ্‌বিখ্যাত মহাবীর হনুমান। এই কপিপ্রবর দারপরিগ্রহের নিমিত্ত কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছেন, কিন্তু সহসা ইঁহার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে। আমার অবস্থাও ভাল নয়। আমার একটি ভার্যা আছেন বটে, কিন্তু আমি বৈচিত্র্যের পিপাসু, ভূমার আস্বাদ লইতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, শুনিয়াছি দাম্পত্যতত্ত্বে আপনার জ্ঞানের পরিসীমা নাই। আপনার জন্য এই পক্ষিমাংস শূলপক্ক করিয়া দিতেছি, আপনি ততক্ষণ কিঞ্চিৎ সৎপরামর্শ দিন।'

ইত্যবসরে মহর্ষি লোমশ একটি অতিকায় পনস ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার সুপক্ক কোষসকল ক্ষিপ্রহস্তে বদনে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এখন ভোজন সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—'পবননন্দন চিরজীবী হও, তুম্বরাজ তোমার জয় হউক। এখন আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেছি। অষ্টাহকাল আমার আহার নিদ্রা নাই, আমি গৃহচ্যুত, কৌপীনমাত্র সম্বল।'

শরাসনে ঝটিতি জ্যারোপণ করিয়া চঞ্চরীক কহিলেন—'প্রভো, কোন্ দুরাচার রাক্ষস আপনার আশ্রম লুণ্ঠন করিয়াছে? অনুমতি দিন, এই দণ্ডে তাহাকে বধ করিব। আহা, আপনার সকল পক্ষীই কি অপহৃতা হইয়াছেন? মহাবীর, অবাক হইয়া ভাবিতেছ কি? গাত্রোত্থান কর, আবার তোমাকে সাগর লঙ্ঘন করিতে হইবে। বিভীষণকে ছাড়িয়া দিয়া ভাল কর নাই।'

লোমশ কহিলেন—'তোমরা ব্যস্ত হইও না, আমার ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্বে এই দক্ষিণাপথে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারকল্পে শতজন নরপতি আমার শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের রাজ্যের হিতার্থে আমি এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা সুবৃষ্টি আনয়ন করি। কৃতজ্ঞ নরপতিগণ দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদের শতকন্যা আমাকে সম্প্রদান করেন এবং ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থাও করেন। আমি এই রাজনন্দিনীগণের বাসের নিমিত্ত আমার তপোবনে এক শত গৃহনির্মাণ করিয়া দিয়াছি।'

চঞ্চরীক জিজ্ঞাসিলেন—'মুনিবর, আপনার তপোবনে ক্রোধাগার আছে তো?

লোমশ কহিলেন—'প্রত্যেক গৃহই ক্রোধাগার। হতভাগিনীগণ নিরন্তর কলহ করে, তাহাদের গৃহকর্ম নাই, পতিসেবা নাই, ব্রত পূজা নাই। আমি আদর করিয়া তাহাদের প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদিক্রমে নবনবতিতমী শততমী পর্যন্ত নাম রাখিয়াছি, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে মূষিকা চর্মচটিকা পেচকী ছুছুন্দরী প্রভৃতি ইতর নামে

সম্বোধন করে এবং আমাকে ভল্লুক বলে। আমি উত্ত্যক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছি, এখন সেই ব্যাপিকাগণ যত ইচ্ছা কলহ করুক। হে রাজন্, তুমি কি ভূমার আস্বাদ চাও? তবে আমার আশ্রমে যাও। শ্রীহনুমানও তথায় পত্নীনির্বাচন করিতে পারিবেন। আমি আর সেখানে ফিরিতেছি না। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি শান্তি চাই এবং আর একটি বিবাহ করিয়া এক পত্নীর যে সুখ তাহাই উপলব্ধি করিতে চাই।'

লোমশ মুনির বচন শুনিয়া হনুমান কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন—'হে তপোধন, প্রণিপাত করি, হে চঞ্চরীক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। এখন বিদায় দাও, আমি সুগ্রীবের নিকট চলিলাম।'

চঞ্চরীক ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—'সেকি! এই গভীর রজনীতে অরণ্যপথে কোথায় যাইবে? অন্তত প্রভাত পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম কর।'

হনুমান কর্ণপাত করিলেন না।

কিষ্কিন্ধ্যায় এক সুরম্য উপবনে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি মিত্রগণের সহিত বসিয়া বানররাজ সুগ্রীব নারিকেল ভক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় হনুমান আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

সুগ্রীব রাজোচিত গাম্ভীর্য সহকারে কহিলেন—'মহাবীর কি মনে করিয়া? আমি এখন রাজকার্যে ব্যস্ত আছি, অবসর নাই, অন্যকালে তোমার বক্তব্য শুনিব।'

হনুমান কহিলেন—'হে বানরাধিপ, আমি এক বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাহায্য-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।'

সুগ্রীব কহিলেন—'কিষ্কিন্ধ্যায় তোমার সুবিধা হইবে না। তোমার অরণ্য-সম্পত্তি যাহা ছিল সমস্তই অঙ্গদ-বাবাজী দখল করিয়াছেন, ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। আমারও এখন অত্যন্ত অভাব চলিতেছে, তোমাকে কিছু দিতে পারিব না। অযোধ্যা ছাড়িলে কেন? ফিরিয়া গিয়া তোমার প্রভু রামচন্দ্রকে নিজ প্রার্থনা জানাও, তিনি অবশ্যই একটা বিহিত করিবেন। রাঘব তো মন্দ লোক নহেন।'

হনুমান কহিলেন—'ওহে সুগ্রীব, তোমার চিন্তা নাই। আমি পূর্বসম্পত্তি চাহি না, তোমার রাজ্যের ভাগও চাহি না, প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনও অভাব নাই। আমি বিবাহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এই অনভ্যস্ত ব্যাপারে আমি সংশয়ান্বিত হইয়াছি, তুমি সৎপরামর্শ দাও।'

সুগ্রীব তখন প্রীত হইয়া কহিলেন—'হে সুহৃদ্বর, তোমার সংকল্প অতিশয় সাধু। এতক্ষণ বাজে কথা বলিতেছিলে কেন? ঐ সুকোমল বৃক্ষশাখায় উপবেশন কর, কিঞ্চিৎ নারিকেলোদক পান করিয়া স্নিগ্ধ হও। হে ভ্রাতঃ, আমি সর্বদাই তোমার হিত-কামনা করিয়া থাকি। কেবলই ভাবি, আহা, আমাদের হনুমান সংসারী হইল না! তুমি বিবাহের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, উহা অতি সহজ কর্ম। দেখ, আমি অষ্টোত্তর-সহস্র ভার্যার পরিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি।'

হনুমান কহিলেন,—'তুমি এই পত্নীপুঞ্জ শাসনে রাখ কি করিয়া? তাহারা কলহ করে না? তোমাকে বাক্যবাণে প্রপীড়িত করে না?'

সুগ্রীব সহাস্যে কহিলেন—সাধ্য কি। আমি কদলীবল্কল দ্বারা তাহাদের ওষ্ঠাধর বাঁধিয়া রাখি, কেবল প্রেমালাপকালে খুলিয়া দিই। যাহা হউক, তোমার ভয় নাই। আপাতত তুমি একটিমাত্র পত্নী গ্রহণ কর, পরে ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি করিও। আমি বলি কি—তুমি অন্যত্র চেষ্টা না করিয়া শ্রীমতী তারাকে বিবাহ কর, আমার আর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই। তিনি প্রবীণা এবং পতিসেবায় পরিপক্কা। তাঁহাকে লাভ করিয়া তুমি নিশ্চয়ই সুখী হইবে।'

হনুমান কহিলেন—'তুমি তারাদেবীর নাম করিও না, তিনি আমার নমস্যা।'

সুগ্রীব কহিলেন—'বটে! অযোধ্যায় থাকিয়া তোমার মতি-গতি বিগড়াইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, তুমি আর এক চেষ্টা করিতে পার। এই কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণে কিচ্চট দেশ আছে। তাহার অধিপতি প্লবংগম অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এখন তাঁহার দুহিতা চিলিম্পা রাজ্যশাসন করিতেছেন। এই বানরী অতিশয় লাবণ্যবতী বিদুষী ও চতুরা। আমি বিবাহের প্রস্তাবসহ দূত পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু লাঙ্গুল কর্তন করিয়া চিলিম্পা তাহাকে বিদায় দিয়াছে। নল নীল গয় গবাক্ষ ইঁহারাও প্রেমনিবেদন করিতে তাহার কাছে একে একে গিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই ছিন্নলাঙ্গুল লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুর্বিনীতা বানরীর উপর আমার লোভ আক্রোশ উভয়ই আছে, কিন্তু আমার অবসর নাই, নতুবা স্বয়ং অভিযান করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতাম। এখন তুমি যদি তাহাকে জয় কর তবে আমার ক্ষোভ দূর হইবে, তোমারও পত্নী লাভ হইবে।'

হনুমান কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—'তাহাই হউক। আমি এখনই কিচ্চট দেশে যাত্রা করিতেছি।'

হনুমান কিচ্চট রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল বপু দেখিয়া প্রজাগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল এবং চিলিম্পাকে সংবাদ দিল—'হে রাজনন্দিনী, আর রক্ষা নাই, এক পর্বতাকার বীর বানর তোমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।'

চিলিম্পা কহিলেন—'ভয় নাই, অমন অনেক বীর দেখিয়াছি। তাহাকে ডাকিয়া আন।'

হনুমান এক মনোরম কুঞ্জবনে আনীত হইলেন। চিলিম্পা তথায় সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার কর্ণে রক্ত-প্রবাল, কণ্ঠে কপর্দমালা, হস্তে লীলাকদলী। হনুমান মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'অহো, সুগ্রীব যথার্থই বলিয়াছেন। এই তরুণী বানরী পরমা সুন্দরী, ইহাকে দেখিবামাত্র আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সংশয় দূর হইল। ইহাকে যদি লাভ করিতে না পারি তবে জীবনই বৃথা।'

ঈষৎ হাস্যে কুন্দদন্ত বিকশিত করিয়া চিলিম্পা কহিলেন—'হে বীরবর, তুমি কি-হেতু বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ? তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমাকে অভয় দিলাম।'

হনুমান উত্তর দিলেন—'হে প্লবংগম-নন্দিনী, আমি রামদাস হনুমান, অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি, তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া আবার অযোধ্যায় ফিরিতে চাই। আমিও তোমাকে অভয় দিতেছি।'

হনুমানের বাক্য শুনিয়া সখীগণ কিলকিলা রবে হাসিয়া উঠিল। চিলিম্পা কহিলেন—'হনুমান, তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়। তোমার কী এমন গুণ আছে যাহার জন্য আমার প্রাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইয়াছ?'

হনুমান কহিলেন—'আমি সেই রামচন্দ্রের সেবক যিনি পিতৃ-সত্য পালনের জন্য বনে যান, যিনি রাবণকে নিধন করিয়াছেন, যিনি দূর্বাদলশ্যাম পদ্মপলাশলোচন, যিনি সর্বগুণান্বিত লোকোত্তরচরিত।

চিলিম্পা কহিলেন—'হে রামদাস, তুমি কি রামচন্দ্রের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?'

হনুমান জিহ্বাদংশন করিয়া কহিলেন—'আমার প্রভু একদারনিষ্ঠ। জনকতনয়া সীতা তাঁহার ভার্যা, যিনি মূর্তিমতী কমলা, যাঁহার তুলনা ত্রিজগতে নাই। আমি নিজের জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।'

চিলিম্পা কহিলেন—'তবে নিজের কথাই বল।'

হনুমান কহিলেন—'নিজের কীর্তি নিজে বলা ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি শত্রু ও প্রিয়ার নিকট আত্মগৌরব কথনে দোষ নাই। অতএব বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি, ভগবান ভানুকে কক্ষপুটে রুদ্ধ করিয়াছি, এই দেখ স্ফোটকের চিহ্ন। আমি সাত লক্ষ রাক্ষস বধ করিয়াছি, রাবণের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়াছি, তাহার রথচূড়া চর্বণ করিয়াছি, এই দেখ একটি দন্ত ভাঙিয়া গিয়াছে।'

চিলিম্পা কহিলেন—'হে মহাবীর, তোমার বচন শুনিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কেবল বীরত্ব চাহে না। তোমার কান্তগুণ কি কি আছে? তুমি নৃত্যগীত জান? কাব্য রচিতে পার?'

হনুমান কহিলেন—'অয়ি চিলিম্পে, রাবণবধের পর আমি অধীর হইয়া একবার নৃত্যগীতের উপক্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু নল নীল প্রভৃতি বানরগণ আমাকে উপহাস করে, তাহাতে আমি নিরস্ত হই। সুমিত্রানন্দন তখন আমাকে বলেন—মারুতি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি যাহা কর তাহাই নৃত্য, যাহা বল তাহাই গীত, যাহা না বল তাহাই কাব্য, ইতরজনের বুঝিবার শক্তি নাই।'

চিলিম্পা তাঁহার করধৃত কদলীগুচ্ছ লীলাসহকারে দংশন করিতে করিতে কহিলেন—'হে পবননন্দন, তুমি প্রেমতত্ত্বের কতদূর জান? তুমি কোন্ জাতীয় নায়ক? ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, প্রশান্ত না ললিত? তুমি কি করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিবে, কি করিয়া আমার মানভঞ্জন করিবে? আমি যদি গজমুক্তার হার কামনা করি তবে তুমি কোথায় পাইবে? যদি রাগ করিয়া আহার না করি তবে কি করিবে?'

হনুমান ভাবিলেন—'এই বিদগ্ধা বানরী এইবার আমাকে সংকটে ফেলিল, ইহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব? যাহা হউক আমি অপ্রতিভ হইব না। —হে সুন্দরী, তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, প্রেমতত্ত্বের ইহাই আমার প্রথম জ্ঞান। তুমি চিন্তা করিও না, কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব আমার অগ্রজতুল্য, তিনি আমাকে সমস্ত শিখাইয়া দিবেন। তুম্বরাজ চণ্ডরীক আমার বন্ধু, তিনিও আমাকে জ্ঞানদান করিবেন। তুমি যদি মুক্তাহার কামনা কর তবে জানকীর নিকট চাহিয়া লইব, যদি আহার না কর তবে এই লৌহকঠোর অঙ্গুলি দ্বারা তোমাকে খাওয়াইব। হে প্রিয়ে, আর বিলম্ব করিও না, আমার সহিত চল। সীতা তোমার হনুমতী নাম দিয়াছেন, তিনি তোমাকে বরণ করিবার জন্য অযোধ্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

চিলিম্পা তখন হনুমানের চিবুকে তর্জনীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন—'ওরে বর্বর, ওরে অবোধ, ওরে বৃদ্ধবালক, তুমি প্রেমের কিছুই জান না। যাও, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দাও।'

হনুমান আকুল হইয়া কহিলেন—'অয়ি নিষ্ঠুরে, আমাকে আশা দিয়া নিরাশ করিতেছ কেন? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।' এই বলিয়া তিনি চিলিম্পাকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিলেন।

চিলিম্পা করতালি দিয়া বিকট হাস্য করিলেন। সহসা বনান্তরাল হইতে কালান্তক যমের ন্যায় দুই মহাকায় নরকপি নিঃশব্দে আসিয়া হনুমানকে অতর্কিতে পাশবদ্ধ করিল। চিলিম্পা কহিলেন—'হে অরঙ্গ-অটঙ্গ, এই মর্কটের বড়ই স্পর্ধা হইয়াছে, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ ছাঁটিয়া দিয়া ইহাকে বিতাড়িত কর।

তখন প্রত্যুৎপন্নমতি হনুমান প্রভঞ্জনকে স্মরণ করিলেন। নিমেষে তাঁহার দেহ হিমাদ্রিতুল্য হইল, পাশ শতছিন্ন হইল, প্রচণ্ড পদাঘাতে নরকপিদ্বয় সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল প্রকম্পিত করিয়া মহাবীর উপ উপ রবে তিন বার সিংহনাদ করিলেন, তাহার পর চিলিম্পার কেশ গ্রহণপূর্বক 'জয় রাম' বলিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফ দিলেন।

ঝঞ্ঝাবাহিত মেঘের ন্যায় হনুমান শূন্যমার্গে ধাবিত হইতেছেন। আকাশবিহারী সিদ্ধ-গন্ধর্ব-বিদ্যাধরগণ বলিতে লাগিলেন—'হে পবনাত্মজ, এতদিনে তোমার কৌমার-দশা ঘুচিল, আশীর্বাদ করি সুখী হও।' দিগ্‌বধূগণ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'হে অঞ্জনানন্দন, মুহূর্তের তরে গতি সংবরণ কর, আমরা নববধূর মুখ দেখিব।' হনুমান হুংকার করিলেন, গগনচারিগণ ভয়ে মেঘান্তরালে পলায়ন করিল, দিগ্‌বধূগণ দিগ্‌-বিদিকে বিলীন হইল।

চিলিম্পা কাতর কণ্ঠে কহিলে -'হে মহাবীর, আমার কেশ ছাড়িয়া দাও, বড়ই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে নতুবা বক্ষে ধারণ কর।'

হনুমান বলিলেন—'চোপ!'

চিলিম্পা বলিলেন—'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পার নাই? আমি যে তোমা-বই আর কাহাকেও জানি না।'

হনুমান পুনরপি বলিলেন—'চোপ!'

নিম্নে কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যাইতেছে। সুগ্রীব স্বল্পতোয়া তুঙ্গভদ্রার গর্ভে অষ্টাধিক সহস্র পত্নীসহ জলকেলি করিতেছেন।

হনুমান মুষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বানরী ঘুরিতে ঘুরিতে সুগ্রীবের স্কন্ধে নিপতিত হইল।

হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই

ভারমুক্ত হইয়া হনুমান দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইলেন। পঞ্চবটী—জনস্থান—চিত্রকূট—প্রয়াগ—শৃঙ্গবের—অবশেষে অযোধ্যা।

সীতা সবিস্ময়ে বলিলেন, 'একি বৎস! সংবাদ দাও নাই কেন? আমি নগরী সুসজ্জিত করিতাম, বাদ্যভাণ্ড প্রস্তুত রাখিতাম। হনুমতী কই?'

হনুমান অবনত মস্তকে বলিলেন—'মাতঃ, হনুমতীকে পাই নাই। আমি এক সামান্যা বানরী হরণ করিয়া সুগ্রীবকে দান করিয়াছি। হে দেবি, বিধাতা আমার এই বিশাল বক্ষে যে ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াছেন তাহা তুমি ও রামচন্দ্র পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, দারাপুত্রের স্থান নাই।'

সীতা বলিলেন—'বৎস, পিতৃ-ঋণ শোধের কি করিলে?'

হনুমান মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'অহো পাষণ্ড! আমি সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। জননী, তুমি এই বর দাও যেন অমর হইয়া চিরকাল পিতৃগণের পিণ্ডোদক বিধান করিতে পারি।'

সীতা বলিলেন—'বৎস, তাহাই হউক।'

তখন হনুমান পরিতুষ্ট হইয়া বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া ভুজদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—'জয় সীতারাম!'

জয় সীতারাম

১৩৩৭ (১৯৩০)

গামানুষ জাতির কথা

যে সময়ের কথা বলছি তার প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে পৃথিবী থেকে মানবজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে। তর্ক উঠতে পারে, আমরা সকলেই যখন পঞ্চত্ব পেয়েছি তখন এই গল্প লিখছে কে, পড়ছেই বা কে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। লেখক আর পাঠকরা দেশ-কালের অতীত, তাঁরা ত্রিলোকদর্শী ত্রিকালজ্ঞ। এখন যা হয়েছিল শুনুন।

বড় বড় রাষ্ট্রের যাঁরা প্রভু তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য অনেক দিন থেকেই চলছিল। ক্রমশঃ তা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মিটমাটের আর আশা রইল না। সকলেই নিজের নিজের ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানটি ন্যাশনাল অ্যানথেম রূপে গাইতে লাগলেন—'আমরা ইরান দেশের কাজী, যে বেটা বলিবে তা না না না সে বেটা বড়ই পাজী।' অবশেষে যখন কর্তারা স্বপক্ষের জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে নিঃসন্দেহ হলেন যে বজ্জাত বিপক্ষ গোষ্ঠীকে একেবারে নির্মূল করতে না পারলে বেঁচে সুখ নেই তখন তাঁরা পরস্পরের প্রতি অ্যানাইহিলিয়ম বোমা ছাড়লেন। বিজ্ঞানের এই নবতম অবদানের তুলনায় সেকেলে ইউরেনিয়ম বোমা তুলো-ভরা বালিশ মাত্র।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের বোমা-বিশারদগণ আশা করেছিলেন যে অপরাপর পক্ষের যোগাড় শেষ হবার আগেই তাঁরা কাজ সাবাড় করবেন। কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সকলেরই আয়োজন শেষ হয়েছিল এবং তাঁরা গুপ্তচরের মারফত পরস্পরের মতলব টের পেয়ে একই দিনে একই শুভলগ্নে ব্রহ্মাস্ত্র মোচন করলেন।

সভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য কোনও দেশ নিস্তার পেলে না। সমগ্র মানবজাতি, তার সমস্ত কীর্তি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গাছপালা, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হল। কিন্তু প্রাণ বড় কঠিন পদার্থ, তার জের মেটে না। সাগরগর্ভে পর্বতকন্দরে জনহীন দ্বীপে এবং অন্যান্য কয়েকটি দুষ্প্রবেশ্য-স্থানে কিছু উদ্ভিদ আর ইতর প্রাণী বেঁচে রইল। তাদের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের দরকার নেই, যাদের নিয়ে এই ইতিহাস তাদের কথাই বলছি।

লণ্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক পিকিং কলকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে রাস্তার নীচে যে গভীর ড্রেন ছিল তাতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর বাস করত। তাদের বেশীর ভাগই বোমার তেজে বিলীন হল, কিন্তু কতকগুলি তরুণ আর তরুণী ইঁদুর দৈবক্রমে বেঁচে গেল। শুধু বাঁচা নয়, বোমা থেকে নির্গত গামা-রশ্মির প্রভাবে তাদের জাতিগত লক্ষণের আশ্চর্য পরিবর্তন হল, জীববিজ্ঞানীরা যাকে বলেন মিউটেশন। কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের লোম আর ল্যাজ খসে গেল, সামনের দুই পা হাতের মতন হল, পিছনের পা এত মজবুত হল যে তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে আর চলতে শিখল, মস্তিষ্ক মস্ত হল, কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কিচকিচ ধ্বনির পরিবর্তে সুস্পষ্ট ভাষা ফুটে উঠল, এক কথায় তারা মানুষের সমস্ত লক্ষণ পেলে। কর্ণ যেমন সূর্যের বরে সহজাত কুণ্ডল আর কবচ নিয়ে জন্মেছিলেন, এরা তেমনি গামা-রশ্মির প্রভাবে সহজাত প্রখর বুদ্ধি এবং ত্বরিত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ধরাতলে আবির্ভূত হল। এক বিষয়ে ইঁদুর

জাতি আগে থেকেই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—তাদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত। এখন এই শক্তি আরও বেড়ে গেল।

এই নবাগত অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান প্রাণীদের ইঁদুর বলে অপমান করতে চাই না, তা ছাড়া বার বার চন্দ্রবিন্দু দিলে ছাপাখানার উপর জুলুম হবে। এদের মানুষ বলেই গণ্য করা উচিত মনে করি। আমাদের মতন প্রাচীন মানুষের সঙ্গে প্রভেদ বোঝাবার জন্য এই গামা-রশ্মির বরপুত্রগণকে 'গামানুষ' বলব।

এখন কিঞ্চিৎ জটিল তত্ত্বের অবতারণা করতে হচ্ছে। যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা মোটামুটি পঁচিশ বৎসর মানুষের এক পুরুষ এই হিসাবে বংশ-পর্যায় গণনা করেন। অতএব ১৮০০০ বৎসরে ৭২০ পুরুষ। আমাদের ঊর্ধ্বতন ৭২০ নম্বর পুরুষ কেমন ছিলেন? নৃবিদ্যাবিশারদগণ বলেন, এঁরা পুরোপলীয় অর্থাৎ প্রাচীন উপল যুগের লোক, চাষ করতে শেখেন নি, কাপড় পরতেন না, রাঁধতেন না, কাঁচা মাংস খেতেন, গুহায় বাস করতেন। ভেবে দেখুন, মোটে ৭২০ পুরুষে আমাদের কি আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। আমাদের যেমন পঁচিশ বৎসরে, ইন্দুরোদ্ভব গামানুষদের তেমনি পনের দিনে এক পুরুষ, কারণ তারা জন্মাবার পনর দিন পরেই বংশরক্ষা করতে পারে। মানবজাতি ধ্বংস হবার পর যে ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সময়ে গামানুষ জাতির ৭২০ পুরুষ জন্মেছে। অর্থাৎ গামানুষের ত্রিশ বৎসর আমাদের ১৮০০০ বৎসরের সমান। যদি সন্দেহ থাকে তবে অঙ্ক কষে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে গামানুষ অতি দ্রুত গতিতে সভ্যতার শীর্ষদেশে উপস্থিত হয়েছে। পূর্বমানব যে বিদ্যা কলা আর ঐশ্বর্যের অহংকার করত গামানুষ তার সমস্তই পেয়েছে। অবশ্য তাদের সকল শাখাই সমান সভ্য আর পরাক্রান্ত হয় নি, তাদের মধ্যেও জাতিভেদ, সাদা-কালোর ভেদ, রাজনীতির ভেদ, ছোট বড় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, পরাধীন প্রজা, দ্বেষ-হিংসা এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগ আছে, যুদ্ধবিগ্রহও বিস্তর ঘটেছে। বার বার মারাত্মক সংঘর্ষের পর বিভিন্ন দেশের দূরদর্শী গামানুষদের মাথায় এই সুবুদ্ধি এল—ঝগড়ার দরকার কি, আমরা সকলে একমত হয়ে কি শান্তিতে থাকতে পারি না? আমাদের বর্তমান সভ্যতার তুলনা নেই, আমরা বিশ্বের বহু রহস্য ভেদ করেছি, প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে কাজে লাগিয়েছি, শারীরিক ও সামাজিক বহু ব্যাধির উচ্ছেদ করেছি, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের রাষ্ট্রনেতা ও মহা মহা জ্ঞানীরা যদি একযোগে চেষ্টা করেন তবে বিভিন্ন জাতির স্বার্থবুদ্ধির সমন্বয় অবশ্যই হবে।

জনহিতৈষী পণ্ডিতগণের নির্বন্ধে রাষ্ট্রপতিগণ এক মহতী বিশ্বসভা আহ্বান করলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় রাজনীতিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক প্রভৃতি মহা উৎসাহে সেই সভায় উপস্থিত হলেন, অনেক রবাহূত ব্যক্তিও তামাশা দেখতে এলেন। যাঁরা বক্তৃতা দিলেন, তাঁদের আসল নাম যদি গামানুষ ভাষায় ব্যক্ত করি তবে পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে, সেজন্য কৃত্রিম নাম, দিচ্ছি যা শুনতে ভাল এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়।

আমাদের দেশে হরেক রকম সভায় কার্যারম্ভের আগে সংগীতের এবং কার্যাবলীর মধ্যে মধ্যে কুমারী অমুক অমুকের নৃত্যের দস্তুর আছে। পরাক্রান্ত গামানুষ জাতির রসবোধ কম, তারা বলে, আগে ষোল আনা কাজ তারপর ফূর্তি। তাদের জীবনকালও কম সেজন্য বক্তৃতাদি অতি সংক্ষেপে চটপট শেষ করে। প্রথমেই সভাপতি মনস্বী চং লিং সকলকে

বুঝিয়ে দিলেন যে এই সভায় যে কোনও উপায়ে বিশ্বশান্তির ব্যবস্থা করতেই হবে, নতুবা গামানুষ জাতির নিস্তার নেই।

সভাপতির অভিভাষণের পর একটি অনতিসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাউণ্ট নটেনফ বললেন, জগতের সম্পদ মোটেই ন্যায়সম্মত পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় নি সেই কারণেই বিশ্ব-শান্তি হচ্ছে না। দু-চারটি রাষ্ট্র অসৎ উপায়ে বড় বড় সাম্রাজ্য লাভ করে দেদার কাঁচা মাল আর আজ্ঞাবহ নিস্তেজ প্রজা হস্তগত করেছে, উপনিবেশও বিস্তর পেয়েছে। কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়েছি, আমাদের বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না। যদি যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হয় তবে বিশ্বসম্পত্তির আধাআধি বখরা আমাদের দিতে হবে।

বৃহত্তম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থ বললেন, জগতের শান্তিরক্ষার জন্যই আমাদের জিম্মায় বিশাল সাম্রাজ্য থাকা প্রয়োজন, সাম্রাজ্য চালনার অভিজ্ঞতা আমাদের যত আছে তেমন আর কারও নেই। আমরা শক্তিমান হলে তোমরা সকলেই নিরাপদে থাকবে। কাঁচা মাল চাও তো উপযুক্ত শর্তে কিছু দিতে পারি। আমাদের হেফাজতে যেসব অসভ্য অর্ধসভ্য দেশ আছে তার উপর লোভ করো না, আমরা তো সেসব দেশবাসীর অছি মাত্র, তারা লায়েক হলেই ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হব। আমরা কারও অনিষ্ট করি না, বিপদ যদি ঘটে আমার বন্ধু কাঁপফ-এর প্রকাণ্ড দেশই তার জন্য দায়ী হবে। এঁর দেশে স্বাধীন শিল্প আর কারবার নেই, সবই রাষ্ট্রের অঙ্গ। যাঁরা সমাজে মস্তকস্বরূপ সেই অভিজাত আর ধনিক শ্রেণীই ওখানে নেই। এঁদের কুদৃষ্টান্তে আমাদের শ্রমজীবীরা বিগড়ে যাচ্ছে। দিনকতক পরেই দেখতে পাবেন এঁদের কদর্য নীতি আর সস্তা মালে জগৎ ছেয়ে যাবে, আমাদের সকলের সমাজ ধর্ম আর ব্যবসার সর্বনাশ হবে। যদি শান্তি চান তো আগে এঁদের শায়েস্তা করুন।

জেনারেল কাঁপফ তাঁর মোটা গোঁফে পাক দিয়ে বললেন, বন্ধুবর লর্ড গ্র্যাবার্থ প্রচণ্ড মিছে কথা বলেছেন তা আপনারা সকলেই বোঝেন। ওঁর রাষ্ট্রই আমাদের সকলকে দাবিয়ে রেখেছে, ওঁরা ঘুষ দিয়ে আমাদের দেশে বারবার বিপ্লব আনবার চেষ্টা করেছেন। এর শোধ একদিন তুলব, এখন বেশী কিছু বলতে চাই না।

পরাধীন দেশের জননেতা অবলদাসজী বললেন, লর্ড গ্র্যাবার্থ যে অছিগিরির দোহাই দিলেন তা নিছক ভণ্ডামি। আমরা লায়েক কি নালায়েক তার বিচারের ভার যদি ওঁরা নিজের হাতে রাখেন তবে কোনও কালেই আমাদের দাসত্ব ঘুচবে না। এই সভার একমাত্র কর্তব্য— সমস্ত সাম্রাজ্যের লোপসাধন এবং সর্বজাতির স্বাধীনতা স্বীকার। অধীন দেশই দ্বেষ-হিংসার কারণ।

মহাতপস্বী নিশ্চিন্ত মহারাজ চোখ বুজে বসে ছিলেন। এখন মৌন ভঙ্গ করে অবল-দাসের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, কোনও চিন্তা নেই বৎস, আমি আছি। আমার তপস্যার প্রভাবে তোমরা সকলেই যথাকালে শ্রেয়োলাভ করবে। গৌরীশঙ্কর-শিখরবাসী মহর্ষিদের সঙ্গে আমার হরদম চিন্তাবিনিময় হয়, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত।

কর্মযোগী ধর্মদাসজী বললেন, এসব বাজে কথায় কিছুই হবে না। আগে সকলের চরিত্র শোধন করতে হবে তবে রাষ্ট্রীয় সদ্‌বুদ্ধি আসবে। আমার ব্যবস্থা অতি সোজা— সকলে নিরামিষ খাও, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন কর, এক মাস (মানুষের হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর) নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য পালন কর, এই সময়ের মধ্যে বুড়োরা আপনিই মরে যাবে, নূতন প্রজাও জন্মাবে না, তার ফলে জগতের জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাবে, খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব থাকবে না। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী কিছুই দরকার হবে না, বিশুদ্ধ ধর্মসংগত উপায়ে সকলেরই প্রয়োজন মিটবে।

পণ্ডিত সত্যকামজী বললেন, আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি যুক্তিতর্কে বা অলৌকিক

উপায়ে কিছুই হবে না। নিরামিষ ভোজন, বিলাসিতা বর্জন আর ব্রহ্মচর্যও বৃথা, এসব উৎকট ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা জোর করে চালানো যাবে না। আমাদের দরকার সত্যভাষণ। এই সভার সদস্যগণ যদি মনের কপাট খুলে অকপটচিত্তে নিজেদের মতলব প্রকাশ করেন তবে বিশ্বশান্তির উপায় সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। আমরা বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতি লাভ করেছি কিন্তু গামানুষ চরিত্রের কিছুই করতে পারি নি। তার কারণ, বিজ্ঞানী যে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করেন তাতে প্রতারণা নেই, জড়প্রকৃতি ঠকায় না, সেজন্য তথ্যনির্ণয় সুসাধ্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রভুরা মিথ্যা ভিন্ন এক পা চলতে পারেন না। এঁদের গূঢ় অভিপ্রায় কি তা প্রকাশ করে না বললে শান্তির উপায় বেরুবে না। রোগের সব লক্ষণ না জানলে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে কি করে?

লর্ড গ্র্যাবার্থ ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বললেন, কেউ যদি মনের কথা বলতে না চায় তবে কার সাধ্য তা টেনে বার করে। সত্য কথা বলাবেন কোন উপায়ে?

জেনারেল কীপফ বললেন, ওষুধ খাইয়ে। সোডিয়ম পেণ্টোথাল শুনেছেন? এর প্রভাবে সকলেই অবশ হয়ে সত্য কথা বলে ফেলে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রদ্রোহীদের এই জিনিসটি খাইয়ে দোষ কবুল করানো হয়, তার পর পটাপট গুলি। আমরা মকদ্দমায় সময় নষ্ট করি না, উকিলকেও অনর্থক টাকা দিই না।

বিশ্ববিখ্যাত বিচক্ষণ বৃদ্ধ ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, বোকা, বোকা, সব বোকা। পেণ্টোথালে লোকে জড়বুদ্ধি হয়। সত্য কথা বলে বটে, কিন্তু বিচারের ক্ষমতা লোপ পায়। আমরা এখানে নেশা করে আড্ডা দিতে আসি নি, জটিল বিশ্বরাজনীতিক সমস্যার সমাধান করতে এসেছি। পেণ্টোথালের কাজ নয়, আমার সদ্য আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইনজেকশন দিতে হবে। গাঁজা থেকে উৎপন্ন, অতি নিরীহ বস্তু, কিন্তু অব্যর্থ। যতই ঝানু কূটবুদ্ধি হন না কেন, ঘাড় ধরে আপনাকে সত্য বলাবে, অথচ বুদ্ধির কিছুমাত্র হানি করবে না। স্থায়ী অনিষ্টেরও ভয় নেই, এক ঘণ্টা পরে প্রভাব কেটে যাবে, তার পর যত খুশি মিথ্যা বলতে পারবেন। ওষুধটি আমার সঙ্গেই আছে, সভাপতি মশায় যদি আদেশ দেন তবে সকলকেই এক মুহূর্তে সত্যবাদী করে দিতে পারি।

কাউণ্ট নটেনফ প্রশ্ন করলেন, পরীক্ষা হয়েছে?

ভৃঙ্গরাজ উত্তর দিলেন, হয়েছে বইকি। বিস্তর ইঁদুর আর গিনিপিগের উপর পরীক্ষা করেছি।

জেনারেল কীপফ অট্টহাস্য করে বললেন, ইঁদুরের আবার সত্য মিথ্যা আছে নাকি? আপনি তাদের ভাষা জানেন?

নন্দী বললেন, নিশ্চয় জানি, তাদের ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারি। যদি বাঁয়ে ল্যাজ নাড়ে তবে জানবেন মতলব ভাল নয়, উদ্দেশ্য গোপন করছে। যদি ডাইনে নাড়ে তবে বুঝবেন তার মনে কোন ছল নেই। তা ছাড়া আমার এক শিষ্যের উপর পরীক্ষা করেছি, তার ফলে বেচারার পত্নী বিবাহভঙ্গের মামলা এনেছে।

সভাপতি চং লিং বললেন, সন্দেহ রাখবার দরকার কি, এইখানেই পরীক্ষা হক না। কে ভলণ্টিয়ার হতে চান—বিজ্ঞানপ্রেমী কে আছেন—এগিয়ে আসুন।

ধর্মদাসজী ডাক্তার নন্দীর কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি রাজী আছি, দিন ইনজেকশন।

নন্দী তখনই পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটি ম্যাগাজিন-সিরিঞ্জ বার করে ধর্মদাসের হাতে ফুঁড়ে পনর ফোঁটা আন্দাজ চালিয়ে দিলেন। ওষুধের ক্রিয়ার জন্য দু মিনিট সময় দিয়ে সভাপতি বললেন, ধর্মদাসজী, এইবারে আপনার মনের কথা খুলে বলুন।

ধর্মদাস বললেন, নিরামিষ ভোজন, খাদ্যে মসলা বর্জন, সর্ব বিষয়ে অবিলাসিতা আর নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য। তবে আমিও মাঝে মাঝে আদর্শচ্যুত হয়েছি।

জেনারেল কীপফ সহাস্যে বললেন, এসব প্যাগলদের উপর পরীক্ষা করা বৃথা, এরা স্বাভাবিক অবস্থাতেও বেশী মিথ্যে বলে না, যা বিশ্বাস করে তাই প্রচার করে। আসুন, আমাকেই ইনজেকশন দিন, সত্য মিথ্যা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

লর্ড গ্র্যাবার্থ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে কীপফের হাত ধরে বললেন, করেন কি, ক্ষান্ত হন, এসব বিশ্রী ব্যাপারে থাকবেন না। যার আত্মসম্মানবোধ আছে সে কখনও এতে রাজী হতে পারে? অভিপ্রায় গোপনে আমাদের বিধিদত্ত অধিকার, একটা হাতুড়ে ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তা ছেড়ে দিতে পারি না। স্থূল মিথ্যা অতি বর্বর জিনিস তা স্বীকার করি, কিন্তু সূক্ষ্ম মিথ্যা অতি মহামূল্য অস্ত্র, তাগ করে লাগাতে পারলে জগৎ জয় করা যায়, তা আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পরিমার্জিত মিথ্যাই সভ্যসমাজের আশ্রয় আর আচ্ছাদন, সমস্ত লোকাচার আর রাজনীতি তার উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনার লজ্জা নেই? এই সভার মধ্যে উলঙ্গ হওয়া যা মনের কথা প্রকাশ করাও তা।

জেনারেল কীপফ নিরস্ত হলেন না, গ্র্যাবার্থের মুঠো থেকে নিজের হাত সজোরে টেনে বাড়িয়ে দিলেন, ডাক্তার নন্দীও তৎক্ষণাৎ সূচীপ্রয়োগ করলেন। তার পর কীপফ দুই হাতে গ্র্যাবার্থকে জাপটে ধরে বললেন, শীগ্‌গির, এঁকেও ফুঁড়ে দিন, একটু বেশী করে দেবেন। ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী ডবল মাত্রা ভেরাসিটিন চালিয়ে দিলেন। কীপফের স্থূল লোমশ বাহুর বন্ধনে ছটফট করতে করতে গ্র্যাবার্থ বললেন, একি অত্যাচার! আপনারা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছেন। সভাপতি মশায়, আপনি একেবারে অকর্মণ্য। উঠুন, এখনই আমার রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাছে টেলিফোন করুন।

কীপফ বললেন, বড় বেয়াড়া পেশেণ্ট, হাড়ে হাড়ে রোগ ঢুকেছে, লাগান আরও দুই ডোজ। ডাক্তার নন্দী বিনা বাক্যব্যয়ে আর একবার ফুঁড়ে দিলেন। তারপর গ্র্যাবার্থ ক্রমশ শান্ত হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, শুধু আমাদের দুজনকে কেন? ওই বজ্জাত গুণ্ডা নটেনফ-টাকেও দিন।

নটেনফ ঘুঁষি তুলে গ্র্যাবার্থকে আক্রমণ করতে এলেন। কীপফ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, থামুন থামুন, সত্য বলতে এত ভয় কিসের? আমরা সকলেই তো পরস্পরের অভি-সন্ধি বুঝি, খোলসা করে বললে কি এমন ক্ষতি হবে?

নটেনফ চুপি চুপি বললেন, আরে, তোমাদের আমি গ্রাহ্য করি নাকি? আমার আপত্তির কারণ আলাদা। আন্তর্জাতিক অশান্তির চেয়ে পারিবারিক অশান্তি আরও ভয়ানক।

এমন সময় দর্শকদের গ্যালারি থেকে কাউণ্টেস নটেনফ তারস্বরে বললেন, দিন জোর করে ফুঁড়ে, কাউণ্ট অতি মিথ্যাবাদী, চিরকাল আমাকে ঠকিয়েছে।

এই হট্টগোলের সুযোগে ডাক্তার নন্দী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে নটেনফের নিতম্বে ভেরাসিটিন প্রয়োগ করলেন। নটেনফপত্নী চিৎকার করে বললেন, এইবার কবুল কর তোমার প্রণয়িনী কে কে।

সভাপতি চং লিং বললেন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, প্রণয়িনীরা পালিয়ে যাবে না, এখন আমাদের কাজ করতে দিন। লর্ড গ্র্যাবার্থ, কাউণ্ট নটেনফ, জেনারেল কীপফ, এখন একে একে খুলে বলুন আপনাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য কি।

গ্র্যাবার্থ বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য অতি সোজা, জোর যার মুলুক তার এই হচ্ছে একমাত্র রাজনীতি। পরহিতৈষিতা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেশ, কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার স্থান নেই। আমরা সভ্য অসভ্য শক্তিমান দুর্বল সকল জাতির কাছ থেকে যথাসাধ্য

আদায় করতে চাই, এতে ন্যায়-অন্যায়ের কথা আসে না। দুধ খাবার সময় বাছুরের দুঃখ কে ভাবে? যখন মাংসের জন্য বা অন্য প্রয়োজনে গরু ভেড়া বাঘ সাপ ইঁদুর মশা মারেন তখন, জীবের স্বার্থ গ্রাহ্য করেন কি? উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, অহিংস হ'য়ে পাথর খেয়ে বাঁচতে পারেন কি? আমরা সর্বপ্রকার সুখভোগ করতে চাই, তার জন্য সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাদের নিরংকুশ হবার উপায় নেই, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, নিজের স্বভাবগত কোমলতা আছে—যাকে মূর্খরা বলে বিবেক বা ধর্মজ্ঞান। তা ছাড়া স্বজাতি আর মিত্রস্থানীয় বিজাতির মধ্যে জনকতক দুর্বলচিত্ত ধর্মিষ্ঠ আছে, তাদের সব সময় ধাপ্পা দেওয়া চলে না, ঠাণ্ডা রাখবার জন্য মাঝে মাঝে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই সভার যা উদ্দেশ্য তা কোনও কালে সিদ্ধ হবে না। প্রতিপক্ষের ভয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পাকা ব্যবস্থায় রাজী নই, আজ যা ছাড়ব সুবিধা পেলেই কাল আবার দখল করব। অভিব্যক্তিবাদ তো আপনারা জানেন, বেশী কিছু বলবার দরকার নেই।

নটেনফ বললেন, আমাদের নীতিও ঠিক ওই রকম। কর্মপদ্ধতির অল্প অল্প ভেদ আছে, কিন্তু মতলব একই। আমরা জাত্যংশে সর্বশ্রেষ্ঠ, জগতের একাধিপত্য একদিন আমাদের হাতে আসবেই, ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হ'ক আমরা মনস্কামনা সিদ্ধ করব।

কীপফ বললেন, আমরাও তাই বলি, তবে আপনাদের আর আমাদের পদ্ধতিতে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশটি প্রকাণ্ড, এখনও অন্য দেশকে শোষণ করবার বিশেষ দরকার হয় নি, তবে ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা এখন থেকেই হাত পাকাচ্ছি।

অবলদাসজী মাথাচাপড়ে বললেন, হায় হায়, এর চেয়ে মিথ্যা কথাই যে ভাল ছিল! তবু একটা আশা ছিল যে এরা এখন ক্ষমতার দম্ভে বুঝতে পারছে না, পরে হয়তো এদের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হবে। আচ্ছা লর্ড গ্র্যাবার্থ, একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আমরা অধীন জাতিরা একটু একটু করে শক্তিমান হচ্ছি। আপনারা যাই বলুন, জগতে সকল দেশে এখনও সাধু লোক আছেন, তাঁরা আমাদের সহায়। আমরা একদিন বন্ধনমুক্ত হবই। আমাদের মনে যে বিদ্বেষ জমছে তার ফলে ভবিষ্যতে আপনাদের কি সর্বনাশ হবে তা বুঝছেন? আমাদের সঙ্গে যদি এখনই একটা ন্যায়সংগত চুক্তি করেন এবং তার জন্য অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেন তবে ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের একেবারে বঞ্চিত করব না। এই সহজ সত্যটা আপনাদের মাথায় ঢোকে না কেন?

গ্র্যাবার্থ বললেন, অবশ্যই ঢোকে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে এক আনা পাব সেই আশায় উপস্থিত ষোল আনা কেন ছাড়ব? আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের জন্য মাথাব্যথা নেই।

অবলদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন। নিশ্চিন্ত মহারাজ আর একবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় কি, আমি আছি।

ধর্মদাস বললেন, ইনজেকশন দিয়ে কি ভাল হল? সবই তো আমাদের জানা কথা। আমাদের শাস্ত্রে অসুরপ্রকৃতির লক্ষণ দেওয়া আছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়।

—আজ আমার এই লাভ হল, এই অভীষ্ট বিষয় পাব, এই আমার আছে, আধার এই ধনও আমার হবে। ওই শত্রু আমি হত্যা করেছি, অপর শত্রুদেরও হত্যা করব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি যা করি তাই সফল হয়, আমি বলবান, আমি সুখী। আমি অভিজাত, আমার সদৃশ আর কে আছে।

সভাপতি সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের মতলব তো জানা গেল, এখন শান্তির উপায় আলোচনা করুন।

গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীপফ সমস্বরে বললেন, আমরা বেশ আছি, শান্তি টান্তি বাজে কথা, আমরা নখদন্তহীন ভালমানুষ হতে চাই না, পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবনযাপন করতে চাই।

এই সভার একজন সদস্য এতক্ষণ পিছন দিকে চুপচাপ ব'সে ছিলেন, ইনি আচার্য ব্যোমবজ্র দর্শন-বিজ্ঞানশাস্ত্রী, এক দিস্তা ফুলস্ক্যাপে এঁর সমস্ত উপাধি কুলয় না। এখন ইনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বিশ্বশান্তির উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, আপনারও একটা ইনজেকশন আছে নাকি?

ব্যোমবজ্র উত্তর দিলেন, পৃথিবীর কোটি কোটি লোককে ইনজেকশন দেওয়া অসম্ভব। প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে আমার আবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা, তার প্রভাবে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। এই বোমা থেকে যে আকস্মিক রশ্মি নির্গত হয় তা কস্মিক রশ্মির চেয়ে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। তার স্পর্শে চিত্তশুদ্ধি, কাম ক্রোধ লোভাদির উচ্ছেদ এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি হয়।

গ্র্যাবার্থ ধমক দিয়ে বললেন, খবরদার, এখানে কোনও রহস্য প্রকাশ করবেন না। আমাদের টাকায় আপনি গবেষণা করেছেন। আপনার যা বলবার আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে গোপনে বলবেন।

নটেনফ লাফিয়ে উঠে বললেন,বাঃ,আমরাই তো ওঁর সমস্ত খরচ জুগিয়েছি! বোমা আমাদের।

কীপফ বললেন, আপনারা ড্যাম মিথ্যাবাদী। আমাদের রাষ্ট্র বহুদিন থেকে ওঁকে সাহায্য করে আসছে, ওঁর আবিষ্কার একমাত্র আমাদের সম্পত্তি।

ব্যোমবজ্র দুই হাতে বরাভয় দেখিয়ে বললেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার বোমায় আপনাদের সকলেরই স্বত্ব আছে, আপনারা সকলেই উপকৃত হবেন। অবলদাসজী, আপনাদেরও দলাদলি আর সকল দুর্দশা দূর হবে। এই বলে তিনি একটি ছোট বোঁচকা খুলতে লাগলেন।

সভায় তুমুল গোলযোগ শুরু হল, গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীপফ এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্র-প্রতিনিধি বোঁচকাটি দখল করবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন।

ধর্মদাস বললেন, ব্যোমবজ্রজী, আর দেরি করছেন কেন, ছাড়ুন না আপনার বোমা।

ব্যোমবজ্রকে কিছু করতে হল না, সদস্যদের টানাটানিতে বোমাটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভুঁইপটকার মতন ফেটে গেল। কোনও আওয়াজ কানে এল না, কোনও ঝলকানি চোখে লাগল না, শব্দ আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমগ্র গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর গ্র্যাবার্থ বললেন, শাস্ত্রীর বোমাটি ভাল, মনে হচ্ছে আমরা সবাই সাম্য মৈত্রী আর স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। নটেনফ, কীপফ তোমাদের আমি বড্ড

ভালবাসি হে। অবলদাস, তোমরাও আমার পরমাত্মীয়। একটা নতুন ইণ্টারন্যাশনাল অ্যানথেম রচনা করেছি শোন—ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই। এস, এখন একটু কোলাকুলি করা যাক।

নিশ্চিন্ত মহারাজ অবলদাসের পিঠ চাপড়ে সগর্বে বললেন, হুঁ হুঁ, আমি বলেছিলাম কিনা?

সভায় বিজয়াদশমী আর ঈদ মুবারকের ভ্রাতৃভাব উথলে উঠল। খানিক পরে নটেনফ বললেন, আসুন দাদা, এখন বিশ্বের কয়লা তেল গম গরু ভেড়া শুয়োর তুলো চিনি রবার লোহা সোনা ইউরেনিয়ম প্রভৃতির একটা বাটোয়ারা হক। জন-পিছু সমান হিস্সা, কি বলেন?

ব্যোমবজ্র সহাস্যে বললেন, কোনও দরকার হবে না, আপনারা সকলেই নশ্বর দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে গেছেন। এখন নরকে যেতে পারেন, বা আবার জন্মাতে পারেন বা একদম উবে যেতে পারেন, যার যেমন অভিরুচি।

কীপফ বললেন, আপনি কি বলতে চান আমরা মরে ভূত হয়ে গেছি? আমি ভূত মানি না।

ব্যোমবজ্র বললেন, নাই বা মানলেন, তাতে অন্য ভূতদের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তার পর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।

১৩৫২ (১৯৪৫)